পৌষ ১৩৮৫
আনন্দমেলা

পত্রিকাটি ধুলো খেলায় প্রকাশের জন্য

হার্ড কপি এবং স্ক্যান করে দিয়েছেন শুভজিত কুণ্ড

এডিট করেছেন সুজিত কুণ্ড

একটি আবেদন

আপনাদের কাছে যদি এরকমই কোনো পুরোনো আকর্ষণীয় পত্রিকা থাকে এবং আপনিও যদি আমাদের মতো এই মহান অভিযানের শরীক হতে চান, অনুগ্রহ করে নিচে দেওয়া ই-মেইল মারফত যোগাযোগ করুন।

e-mail : optifmcvbertron@gmail.com

কেটে রেখে দাও

বোর্নভিটা আবিষ্কারের আজব কাহিনী-৪

রেকর্ড প্লেয়ারের বিস্ময়কর কথা

আবিষ্কারক : টমাস আল্‌ভা এডিসন
১৮৪৭-১৯৩১ ইউনাইটেড স্টেটস্

সূত্র : শব্দ তরঙ্গ এক ধরনের স্পন্দন সৃষ্টি করে যা একটি চাকতি বা ডিস্কের ওপর ধরে রাখা বা রেকর্ড করা যায়; এবং পরে সেই ডিস্কটি রেকর্ড প্লেয়ারে চালিয়ে, রেকর্ড করা মূল শব্দটি পুনরায় হুবহু ধ্বনিত করা যায়।

বছর : ১৮৭৭ (মূল সংস্করণটিতে, একটি চোঙ্গার মধ্যে দিয়ে মোমের বেলন আকারের বস্তুর ওপর রেকর্ড করা হয়েছিল)

রেকর্ড প্লেয়ার কি ক'রে কাজ করে ?

রেকর্ড করার জন্যে,শব্দকে মাইক্রোফোনের মাধ্যমে বৈদ্যুতিক কম্পনে রূপান্তরিত করা হয়, তারপর সেই কম্পনকে একটি ডিস্কের ওপরে, সূক্ষ্ম পেঁচানো খাঁজের আকারে রেকর্ড করা হয়। কম্পনের আবেগের ওপর খাঁজের গভীরতার কমবেশী নির্ভর করে, এবং তা থেকে সৃষ্টি হয় মূল শব্দের রেকর্ড।

যে রেকর্ড প্লেয়ার ডিস্ক থেকে শব্দ পুনরায় ধ্বনিত করে, তার প্রধান দুটি অংশ হল : ১. টার্ণ-টেবল্, ২. টোন-আর্ম।

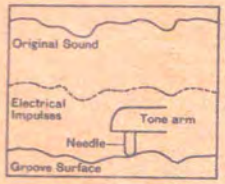

টার্ণটেবল্, তার ওপরে বসানো ডিস্কটিকে এক অবিরাম সমগতিতে ঘোরায়—ফলে, প্রতি মিনিটে সেটি নির্দিষ্টবার ঘোরে, অর্থাৎ রেভোলিউশন পার মিনিট—(৩৩⅓, ৪৫ অথবা ৭৮ আরপিএম)। টোন-আর্মের এক প্রান্ত পিভটের ওপর ভর দিয়ে ঘোরে এবং অন্য প্রান্তে একটি পিন থাকে যেটি চালানোর সময় রেকর্ডের ওপর বসানো হয়। ডিস্কটি যখন ঘোরে, তার ঘুরন্ত খাঁজের ওপর বসানো পিনটি খাঁজের গভীরতার কমবেশী 'অনুভব' ক'রে কম্পন-তরঙ্গ তৈরী করে। পিনের এই কম্পন-তরঙ্গ বৈদ্যুতিক স্পন্দনে রূপান্তরিত হয়, যা আবার সম্প্রসারিত হয়ে অর্থাৎ অ্যামপ্লিফায়েড হয়ে স্পীকারের মধ্যে গিয়ে মূল শব্দকে পুনরায় ধ্বনিত করে।

ক্যাডবেরিস্
বোর্নভিটা
তোমাকে দেয় এগিয়ে থাকার বাড়তি শক্তি

OBM/2039 BEN

বিশেষ সুযোগ-৪

এক বিশিষ্ট পরিবেশকের সঙ্গে বিশেষ ব্যবস্থা অনুসারে আমরা বৃটেনে মুদ্রিত "The How and Why Wonder Book of Robots and Electronic Brains" (ইংরেজীতে) ৪ টা : ৫০ পয়সার সুলভ মূল্যে (আসল মূল্য : ৩৫ পেন্স) বিনা ডাক খরচে, যোগানোর ব্যবস্থা করেছি। এই বইটি পাওয়ার জন্যে আপনি মানি-অর্ডার দ্বারা ৪ টা : ৫০ পয়সা আর পৃথক ডাকে বোর্নভিটার যে কোনো প্যাক থেকে একটি ফয়েল বা ওপরের ফ্ল্যাপ পাঠান এই ঠিকানায় : Deptt. : No.13C. India Book House, 22 Bhulabhai Desai Road, Bombay 400026. শিগ্‌গীর। বই কিন্তু বেশী নেই।

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষা-অধিকার
কর্তৃক অনুমোদিত শিশুপাঠ্য মাসিকপত্র

আনন্দমেলা

পৌষ ১৩৮৫, ডিসেম্বর ১৯৭৮, চতুর্থ বর্ষ, নবম সংখ্যা
দেড় টাকা

বিশেষ রচনা
স্বরবর্ণ । যতীন্দ্রমোহন বাগচী ৪

ছড়া ও কবিতা
খোঁড়া। সুভাষ মুখোপাধ্যায় ৯ ● শীত-শীতুলী। বিমলচন্দ্র ঘোষ (মৌমাছি) ১৭
সবুজে বাতি । দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় ৫০

গল্প
আওয়াজ দিও না । গীতা বন্দ্যোপাধ্যায় ৫
সঙ্গী । আলোক সরকার ১৮
টুম্‌পা ও ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী । সুব্রত নিয়োগী ৩২

উপন্যাস
বনবিবির বনে । বুদ্ধদেব গুহ ১১
ভুতুড়ে কুকুর । আশাপূর্ণা দেবী ৩৭

আত্মকথা
খেলতে খেলতে । চুনী গোস্বামী ১৫

ভ্রমণ-কাহিনী
ভেনিস । রাধানাথ চট্টোপাধ্যায় ২৩

কমিক্‌স
বিশ্বকাপ-ফুটবল ২১ ● টারজান ২৬ ● টিনটিন ৩০
গোয়েন্দা-বাজ ৩৬ ● নোলেদা ৫৩

লেখাপড়া
মজার পড়া । কুন্তক ২৫
সহজে ইংরেজি । প্রসাদ ৪১

খেলাধুলো
লাহোরে হার, করাচিতেও তা-ই । অশোক দাশগুপ্ত ৪৫
অবিস্মরণীয় ফ্র্যাঙ্ক উলী । মুকুল দত্ত ৪৭
অ্যাশেজ-এর লড়াই । সুব্রত সরকার ৪৯
প্রকাশের সামনে মস্ত পরীক্ষা । অলোক দাশগুপ্ত ৫১
প্রথম এশিয়ান গেম্‌স । পুষ্পেন সরকার ৫২

ধাঁধা-মজা-রহস্য
শব্দ-সন্ধান ২৮ ● ধাঁধা ২৮ ● কিসের ফোটো ২৯
উত্তর বটে ২৯ ● মজার খেলা ২৯ ● আটখানা ২৯

অন্যান্য লেখা
তোমাদের পাতা ২২ ● মণিমেলার খবর ৪৩ ● দুঃসাহসিক অভিযান ৪৩
আঁকো ৫৪ ● শেখো ৫৪

কপিলদেবের রঙিন ছবি ৫৬

প্রচ্ছদ বিমল দাশ

সম্পাদক ঃ নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী

আনন্দবাজার পত্রিকা লিমিটেড-এর পক্ষে বাপ্পাদিত্য রায় কর্তৃক ৬ প্রফুল্ল সরকার স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত এবং আনন্দ অফসেট প্রাইভেট লিমিটেড, পি ২৪৮ সি·আই·টি· রোড কলকাতা-৭০০০৫৪ থেকে মুদ্রিত।
বিমান মাশুল ঃ ত্রিপুরা ১৫ পয়সা, পূর্বাঞ্চলের অন্যান্য স্থানে ২০ পয়সা

স্বরবর্ণ

অ আ—

যতীন্দ্রমোহন বাগচী

অ

অ-এ অসুখ তো আর নাই ।

আ

আ-এ আম দু'টো আজ খাই ॥

ই

ই-তে ইলিস ভাজা ।

ঈ

ঈ-তে ঈগল রাজা ॥

উ

উ-তে উনান জ্বালার আগে ।

ঊ

ঊ-তে ঊষায় সবাই জাগে ॥

ঋ

ঋ-এ ঋষি থাকেন বনে ।

ঌ

ঌ-এর কথা কেউ না শোনে ॥

এ

এ-তে এইখানে দাও দৈ ।

ঐ

ঐ-এ ঐখানে দাও খৈ ॥

ও

ও-এ ওয়াড় পরাও লেপে ।

ঔ

ঔ-এ ঔষধ দাও মেপে ॥

ছবি বিমল দাশ

গত সংখ্যায় আমরা স্বর্গত কবি যতীন্দ্রমোহন বাগচীর একটি ছড়া ছেপেছিলাম। এ-সংখ্যায় ছাপা হল স্বরবর্ণ-পরিচয়। এই রচনাও ইতিপূর্বে অপ্রকাশিত। পাণ্ডুলিপিতে দেখছি, কবি নানাস্থানে বিকল্প-শব্দ অথবা বিকল্প-পঙ্‌ক্তি লিখেছিলেন। সেগুলি এইরকম :

অ-এ **অশথগাছের কাছে/আ-এ আটচালাটি আছে**। ই-তে ইলিস 'ভাজা'র পাশে আছে বিকল্প শব্দ 'তাজা'। উ-তে **উনান জ্বালে/ঊ-তে ঊষাকালে**। এ-তে **একশো পাহাড় টলে/ঐ-তে ঐরাবতের বলে**। ও-এ **ওঝাতে ভূত ঝাড়ে/ঔ-এ ঔষধে কি পারে?**

এই রচনা কবিকন্যা শ্রীমতী ঊর্মি সান্যাল ও শ্রীমতী গীতা চৌধুরীর সৌজন্যে প্রাপ্ত।

আওয়াজ দিও না

গীতা বন্দ্যোপাধ্যায়

ওরা তিন বন্ধু তিন রকমের। কিন্তু তাতে ষড়যন্ত্র আটকায় না। বরং জমে। রকমারি বুদ্ধির ঠোকাঠুকিতে বেজায় জমজমাট হয়ে ওঠে সব কিছু।

অজিতদার ওপর ওদের বড্ড নির্ভর। এ পাড়ার রাস্তা-টীমের স্টার প্লেয়ার। সবাই বলে লেকের 'পেলে'। এবার উচ্চ মাধ্যমিক দেবে। তাই খেলায় ঢিলে পড়েছে। বাবা বলেছেন, "এ দেশে তো পেলে হতে পারবে না, পিলেলিভারে ভুগে মরবে—উচ্চ মাধ্যমিকটা কায়দামতো পাশ না করতে পারলে—কপালে কী আছে বাজিয়ে দেখো। আমি আর কী বলব!"

ব্যস, এর ওপর আর কথা চলে না। তাছাড়া ওরা তিনজন তো নেহাতই নাবালকের দলে পড়ে আছে। পঞ্চম শ্রেণীর গোড়ার দিকে রয়েছে। একসঙ্গে বয়েস ধরলে অবিশ্যি তিন দশে তিরিশ বছর হয়।

টুকুন ফিসফিস করে তাতাকে বলল, "কেবল তুই আর আমি জানব—আর কেউ নয়। অজিতদা পর্যন্ত নয়।"

"পিকলু?"

"বড্ড অন্যমনস্ক টাইপ। তাছাড়া মাথাটা ওর প্যাঁচে-প্যাঁচে ঘচাং। আর জানিস তো ঠাকুমা বলেছেন—একে মিনমিন, দুয়ে পাঠ, তিনে গোলমাল, চারে হাট।"

"পিকলু দুয়ে পাঠ হোক। আমি এলেবেলে হই। তাহলে তুই মিনমিন হতে পারবি। তিনের গোলমালে কাজ কী?

"চারে হাট বসিয়েও দরকার নেই। অজিতদাকে লিস্টের বাইরে রাখ্।"

একটা লিস্ট বানিয়ে ফেলার জন্যে গুপ্ত ডাইরি বের করে আনল টুকুন। কী কী মুশকিল আর কী কী সুবিধে তারই লিস্ট। মুশকিলের দিকটা বেশ লম্বা হয়ে পড়ল।

ঠোঁট উলটে তাতা বলল, "কেস ক্যান্টার হতে পারে।"

"দেখা যাক না। ধেড়িয়ে যাচ্ছে দেখলে অজিতদার ডিপার্ট-মেন্টে বডি ফেলে দেব।"

অজিতদার মতো একটা হীরো ইদানীং এ-অঞ্চলে জন্মায়নি। এ রাস্তায় চার বছর ধরে ফুটবল, ক্রিকেট—যে সময়ের যে খেলা—সব ওরা খেলে। কাঁচ ভাঙার রেকর্ড অজিত-দারই সব চাইতে কম—পাপাদের বাড়ির বাথরুমের একটা কাঁচ ফাটিয়েছে মাত্র। চৌকস খেলোয়াড়। মাঝে মাঝে লেকের মাঠে ম্যাচ খেলতে যায়। সতেরো বছর বয়েস হলে কী হয়! প্রায় ছ ফুট লম্বা, চুলগুলো কানের পাশে কোঁকড়ানো। হেরে যায় যেদিন, সেদিনও পাড়ার ছেলেদের মনে হয় ওরা জিতেছে। অজিতদার এমনি মহিমা।

তাছাড়া অজিতদা গলাটা নিচু স্কেলে বেঁধে দারুণ কড়া-কড়া ব্যাঁকা-ব্যাঁকা যুক্তি দিতে জানে। উচিত কথার রাজা। স্টক বিস্তর। পেরে ওঠা অসম্ভব।

গত রবিবার সন্ধেবেলা এক কাণ্ড হল। পাড়াটা বাঙালি অবাঙালি মিশিয়ে একরকম পাঁচমিশালি ধরনের হলেও টেলি-ভিশনে সকলেই হিন্দি ফিল্ম দেখার জন্যে ব্যস্ত থাকেন। পাছে কোনো গোলমাল হয়, তাই এ-ব্যাপারে সকলে হাসি-হাসি মুখে এ ওর চেঁচামেচি সহ্য করেন। সেদিন হঠাৎ এক ভদ্রলোক অজিতদাকে উদ্দেশ করে বললেন, "এ কী, ফুটপাথে আবার ব্যাডমিন্টন খেলতে শুরু করেছ? সন্ধেবেলায় রাস্তায়

সুরেশ জোর কদমে চলছে
সুরেশ ও জগ্গু স্কুলে চলেছে।
আরে জোরে চল, ভ্যাবারাম!
জগ্গু সুরেশকে জ্বালাতন করছে।
ভালো হবেনা জগ্গু, বন্ধ করো!
তারা কিছুক্ষণের জন্য থামলো।
নিউট্রামুলের ওপর আমার পুরো ভরসা আছে।
পারেতে— জগ্গু সুরেশকে ঠেলতে গিয়ে পা পিছলে পড়ে গেলো।
আরে সামলে!
বাঁচা ভাই — আ-হ-হ-হ!!
হাত পাকড়াও— আমি তোমায় টেনে তুলছি!
জগ্গু খুব লজ্জা পেয়ে।
ভাই, তোর গায়ে খুব জোর —ধন্যবাদ!
নিউট্রামুল খাও— —তোমারও খুব জোর হবে!
সুরেশ রোজ নিউট্রামূল খেতে দারুণ ভালোবাসে। নিউট্রামূল হ'ল আমূলের তৈরী সুস্বাদু শক্তিবর্ধক পানীয়। আমূল মিল্কের ঘন ক্রীমের পুষ্টিতে ভরপুর নিউট্রামূলে আছে—আসল কোকো, মল্ট আর চিনি।
আর আশ্চর্য্য! এত গুণ সত্বেও নিউট্রামূলের দাম কম। নিউট্রামূলের ৫০০ গ্রাম টিন মাত্র ১২ টাকা ২১ পয়সা, স্থানীয় কর, সেণ্ট্রাল সেল্‌স ট্যাক্স ও মাশুল আলাদা।
সুরেশ আর এখন জগ্গুও সারাদেশের হাজার হাজার লোকের মতনই রোজ নিউট্রামূল খেতে দারুণ ভালোবাসে।
আমূল-এর
নিউট্রামুল
প্রতি কাপ কর পান, হয়ে ওঠো পালোয়ান!
daCunha N

আলোয় না খেলে বরং পড়ো। বিদ্যাসাগর মশাই কী করতেন? পড়তেন। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষা তো এসে গেল।"

তক্ষুনি মিণ্টি একটু হাসি খেলে গেল অজিতদার ঠোঁটের পাশ ঘেঁষে। গলায় মিছরি ঢেলে বলল, "রোজ তো খেলি না মেসোমশাই। যেদিন লোডশেডিং থাকে সেদিন মোমবাতি জেবলে পড়ি। কেননা সেদিন তো আপনাদের টেলিভিশনের প্রচন্ড আওয়াজ শুনতে পাই না। বিশেষ করে টিভিতে যেদিন হিন্দি ছবি দেখানো হয়, সেদিন ফুটপাথে ক্যারম বা দাবার আসর জমাতে চেষ্টা করি। অন্তত খেলার উন্নতি হবে। উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ব্যাপারে আপনার, আমার পাড়ার কারুর কি মাথাব্যথা আছে?"

ততক্ষণে পাড়ার মেসোমশাইটি সুড়ুত করে ঘরে ঢুকে পড়েছেন।

আর ঠিক এই সময়ই তাতা আর টুকুনের ষড়যন্ত্রটা জন্ম নিল। চোখে চোখে।

শেষ অবধি পিকলুকে নেওয়া হবে ঠিক হল। ওর টেকনিকাল জ্ঞান খুব উঁচু দরের। তাছাড়া আজকাল ও কেঁচো, ব্যাঙ পিঁপড়ে অথবা সাদা ইঁদুর, গিনিপিগ—এসব পোষা কিছুদিনের জন্যে কমিয়ে দিয়েছে। এখন ও সর্বক্ষণের মিস্ত্রি। বাড়িতে ফিউজ সারানো থেকে টেবিল-ল্যাম্প ঠিক করা পর্যন্ত সবই করে থাকে। এতে বাড়িতে ওর রীতিমতো খাতির বেড়েছে।

এ হেন পিকলুকে যে কোনো ষড়যন্ত্রে নিতেই হয়। ইলেকট্রিকের কাজ না জেনে কোনো শক্ত কাজে নামা উচিত নয়। অন্তত এই বিদ্রোহ বা ষড়যন্ত্রের নেতাদের এসব কাজ কিছুটা জানা উচিত ছিল বলে তাদের মনে হতে লাগল। এখন পিকলু সহায়।

পরের রবিবার সন্ধেবেলায় ওরা ওদের খেলা খেলবে। তাক লেগে যাবে ছেলেবুড়োর!

লেকের মাঠে শুয়ে শুয়ে একটা গংগা-ফড়িংয়ের লম্ফঝম্ফ দেখতে দেখতে পিকলু অন্যমনস্কভাবে বলল, "তিনজনে হবে না। খুব গোলমেলে কাজ। আমারই তো দুজন অ্যাসিস্ট্যান্ট চাই।"

"অসম্ভব! ফাঁস হয়ে যাবে।" তাতা গুপ্ত ডাইরিতে কী সব লিখতে লিখতে বলল।

"বেশ, তোরা দু'জনে যা হয় কর। আমার দ্বারা হবে না।"

আজ ওরা তিনজনই ইস্কুল যাবার নাম করে এসেছে লেকের দ্বীপটায় বসে শেষ বারের মতো সব ঠিকঠাক করে নিতে। টুকুন টিফিন খাচ্ছিল। ইস্কুলে গিয়ে ও আগেই টিফিনটা খেয়ে নেয়। এ অব্যেসটা ওর নার্সারি ক্লাস থেকে। ওর মতটা তাড়াতাড়ি দিতে গিয়ে তাই প্রচন্ড বিষম খেল।

"পিক্‌লু এখন ব্যাক আউট করবি নাকি? কী অদ্ভুত রে তুই?"

"ব্যাক আউট করব কেন? তোরাই তো মুশকিল করছিস। আগে আমাকে ব্যাপারটা বুঝিয়ে দে। এটা কি বিদ্রোহ না ক্যু, না ছোটদের ডিটেকটিভ হওয়ার বাজে গপ্প, হাইজ্যাক করা?"

"ক্যু কী রে?" তাতার কানে কথাটা অদ্ভুত লাগল।

"ক্যু হল একরকম বাজে ষড়যন্ত্র। কাগজে পড়িসনি? অনবরত হচ্ছে আজকাল। আমার বাবা তো সাংবাদিক—বেশির ভাগ সময় বিদেশে এই সব খবর জোগাড় করে প্রবন্ধ লেখেন। বাবা বলেন, সব চাইতে বিচ্ছিরি জিনিস হচ্ছে হাইজ্যাক করা। একটা-দুটো লোক মিলে প্লেনের প্যাসেঞ্জারদের বন্দুক দেখিয়ে দুষ্টুমি করে টাকাকড়ি কেড়ে নেয়।"

এবার টুকুন সজাগ হয়ে উঠল,

"বিদ্রোহটা তাহলে ঠিক কী?"

"বিদ্রোহ হল—হুঁ, দাঁড়া ভেবে নিই। বিদ্রোহ হল—দেশ জেগে উঠে অস্ত্রশস্ত্র নিয়ে যখন একটা পচা-বোকা-হাবাটে সরকারকে হারিয়ে দিতে মেতে ওঠে—তাই। বুঝেছিস?"

"মোটামুটি।"

তাতা তাড়াতাড়ি বলে উঠল, "আমরা কিন্তু সেই সব ন্যাকা-ন্যাকা খুদে ডিটেকটিভ হতে চাই না। ও তো কেবল চোর ধরার বাজে গপ্প। বড়দের দেখাদেখি ছোটদের ঘুর-ঘুর করা। বোগাস!"

পিকলু বিজ্ঞের মতো একটু হাসল, "আমি কোনোদিনও ডিটেকটিভ হব না। বাবা বলেছেন, শার্লক হোমসের পর যে সব ডিটেকটিভ তৈরি হয়েছে বেশির ভাগ মেকি। দিদিভাইরা যে ইউনিক না কিসের গিলটি গয়না পরে তাই।"

শেষ অবধি ঠিক হল, ঘটনা ঘটাবার পর ওরা ঠিক করবে সেটা কী জাতের জিনিস হল। কেবল তিনজনই একমত হল যে, ওটা কিছুতেই গোয়েন্দা-কাহিনী হবে না। আরও ঠিক হল পিকলুকে দু'জন সহকারী দেওয়া হবে। বিশ্বাসযোগ্য হবে, পেটে কথা থাকবে, মার খেলেও দলের কাউকে ফাঁসাবে না—এমন ছেলেমেয়ে ক'টা আছে? পেলে হয়।

অনেকদিন আগে বাবার এক ভবঘুরে বন্ধুর আড্ডায় কালীঘাটে রতন বলে একটা ছেলের সঙ্গে আলাপ হয়েছিল পিকলুর। ছেলেটা বিসর্জনের মিছিলে সাদা ড্রেস পরে ড্রাম বাজায়। বাজালে দিনে পাঁচ টাকা করে পায়। দারুণ ছেলেটা। আর-একটা ছোট মেয়ে আছে মানু বলে। সেও ঐ দলেরই। খুব গরিব বলে ওর প্রায়ই ইস্কুলে যাওয়া হয় না। ফ্রী স্কুল। তা-ও যেতে পারে না। রান্না হয় না যে! চাল কেনার পয়সা থাকে না। মার সঙ্গে আজকাল ওর দিদিও সকালে বাসন মাজার কাজ নিয়েছে। ছোট মেয়েটার কী গানের গলা! কিন্তু মানুও মাঝে মাঝে বাসন মাজার কাজ করছে। কিন্তু ওদের পেটে কথা থাকে। আর বিশ্বাস করা যায়।

পিকলুর কথামতো ওরা গেল কালীঘাটের সেই ঘিঞ্জি পল্লীতে। পোটো পাড়ায়। রতন আর মানুর সঙ্গে কথা ঠিক করে এল। না, সন্ধেবেলায় ওদের কোনো অসুবিধে নেই। আগের দিন গিয়ে সব বুঝে আসবে। আজ বাদে কাল শনিবার। তারপর রবিবারেই তো খেলা। জমবে।

দেখতে দেখতে রবিবার এসে গেল। সকালে পাড়ার টীমের খেলায় তাতা আর টুকুনের টিকির দেখা মিলল না। অজিতদা বার বার এদিক ওদিক তাকাল—"কী ব্যাপার? উঠতি খেলোয়াড়রা গেল কোথায়? ক'দিন ধরে লক্ষ করছি, ওরা অন্য কী একটা ব্যাপার নিয়ে ফেঁসেছে। এই যে, মহামান্য বিজ্ঞানী পিকলুবাবু এদিকেই আসছেন।"

পিকলুর কোনো দিকে নজর ছিল না। রতন আর মানুকে ওদের কী করতে হবে না হবে তা ও ভালভাবে বলে দিচ্ছে। অজিতদার জোর ডাকে চমকে উঠল। "ওঃ, কে? অজিতদা?"

"আজ্ঞে! তা এত গুজুর-গুজুর ফুসুর-ফুসুর কিসের রে তোদের? ও দুটো গাধা তো ডুব দিয়েছে স্বখাত সলিলে—ডুবে না যায়! ঝেড়ে কাসো তো বাপু! বলে ফেলো।"

পিকলুর সঙ্গে অজিতদার একটা দারুণ মিল আছে। কিছু একটা না বলতে চাইলে অজিতদা সব সময় একটা অপ্রস্তুত মিটিমিটি হাসি ঠোঁটে লাগিয়ে রাখে। কথা বলে না। পিকলু সেই রকমভাবে কিছু না বলে হাসি মাখানো চোখে চেয়ে রইল। তারপর হাসি-হাসি মুখেই মানু আর রতনকে নিয়ে এগিয়ে গেল।

পিকলু : "কেটেল ড্রামটা বাজাবি।"

রতন : "সঙ্গে দল আনব?"

পিকলু: "আনিস। পাঁচজন সেজে আসিস।"

মানু: "আমি কী করব?"

পিকলু: "গান গাইবি। যে গানটা শিখিয়ে দিলাম। ছোট গান। আমার এক দাদা লিখে দিয়েছে। সুরটা তুই দিয়ে নিস।"

রতন: "সে কী! ও সুর দেবে কী রে?"

পিকলু: "মানু পারবে দেখিস। পারবি না?"

মানু: "আমি কেবল দুঃখের গান জানি। কেত্তনের সুর দেব? একবার পাড়ার যাত্রায় গেয়েছিলুম।"

পিকলু: "দে না। যা ভাল লাগে।"

রতন: "যাঃ! তোরা কী অদ্ভুত! লোকসঙ্গীত বা আধুনিক কর।"

গিয়ে দেখল, যে-জায়গাটায় তাতা আর টুকুনের থাকার কথা ছিল সেখানে ওরা নেই। তবে ঘাসের ওপর বসতে না বসতে ধুঁকতে-ধুঁকতে এল টুকুন। ওদের ফ্যামিলির ঐতিহ্য অনুসারে ওর যা হবার হয়েছে। প্রচণ্ড পেটের অসুখ। ঘর-বার অবস্থা। বিকেলের দুর্ভাবনায় বেড়ে গেছে। তাতার সমস্যা অন্য। যদি কোনো রকমে ধরা পড়ে তো ওর জীবন বিষ হয়ে যাবে লেকচারের ধমকে। ফ্যামিলি পঞ্চায়েত বসবে। তার-পর দরকার মতো ছপটিও বাদ যাবে না। ওর বাবার একটু হাত চলে।

ঠিক হল সন্ধে ছ'টায়, সবাই বলে দেওয়া জায়গায় জড়ো হবে। তারপর ইশারা করে নির্দেশনা চলবে। ফল হলে ভাল। না হলে ভবিষ্যতে আবার চেষ্টা করতে হবে।

কাঁটায় কাঁটায় ছটা। দেখা গেল ছায়াছবির মতো কিছু ছোটখাটো মূর্তি সিঁড়ি দিয়ে ছাদে উঠছে, নামছে। এ ফ্ল্যাটে ও ফ্ল্যাটে ঢুকছে বেরুচ্ছে। যখন কেউ কোথাও নেই, তখন পকেট থেকে কী সব বার করে কী সব খুলছে, পরাচ্ছে। পিকলুকে চেনা যায়, কেননা ও এই সব ছায়ামূর্তিদের মধ্যে মার্কামারা। ছোটখাটো শান্তশিষ্ট চালচলন। ওর পকেটগুলোও চোখে পড়ার মতো। হাতুড়ি স্ক্রু-ড্রাইভারগুলো মাথা বের করে আছে। ও ঠেলে ঠেলে দিচ্ছে বটে, কিন্তু ওরা ঠাঁটার মতো মাথা-গুলো ঠায় উঁজিয়ে রাখছে।

সাড়ে ছটা নাগাদ সব অন্য রকম হয়ে গেল। রাস্তায় হঠাৎ কেটেল ড্রাম বাজিয়ে মার্চ করে বিসর্জনের মিছিলের ড্রেস পরা একদল খুদে-খুদে ছেলেমেয়ে পাড়ায় ঢুকে পড়ল। সকলে তখন সবে টিভি খুলতে যাচ্ছে। একবার রাস্তাটা ঘুরে এসে ওরা অজিতদাদের বাড়ির সামনে দাঁড়াতেই চোখে কাজল পরা, কপালে টিপ দেওয়া, আট বছরের মানু চড়া গলায় গান গেয়ে উঠল, "গাছ পুঁতেছি ফুটপাথরে—পাতা হয়েছে দুটো, ও ভাই আওয়াজ দিও না। গাইবে ওতে ছোট্ট পাখি। ও আকাশ বাধা দিও না। আওয়াজ থামাও গান শুনব, আওয়াজ থামাও ধান বুনব—ফুটপাথরের গাছটা বাঁচাও—আওয়াজ দিও না...ও দাদা, মেরে ফেলো না—"

চারধারে ভিড় জমে গেল। বারান্দায় বারান্দায় লোকজন ঝুঁকে-ঝুঁকে দেখছে। একজন গলা চড়িয়ে পাশের বাড়ির বন্ধুকে বললেন, "আমার টিভিটা ডেড্। চলছে না।"

"আমারটাও—অথচ লোডশেডিং তো হয়নি।" হৈ-চৈ পড়ে গেল। পর-পর অনেকগুলো বাড়িতেই দেখা গেল টিভি চলছে না।"

পিকলুর পাশে এসে ওর সেই কবিদাদা দাঁড়িয়েছিলেন। বললেন, "চমৎকার গলা তো বাচ্চা মেয়েটার। গানটা গদ্য হলেও খাসা।"

পিকলু অবাক হয়ে বলল, "ওটা তো তোমার লেখা। না?"

"যাঃ, আমারটা বেশ বাজে হয়েছিল। মেয়েটাই লিখেছে মনে হচ্ছে। চমৎকার বেঁধেছে কথাগুলো। পাঁচালির মতো লাগছে।"

অজিতদা হাততালি দিয়ে উঠে বলল, "কেয়া বাত! আওয়াজের বিরুদ্ধে দারুণ আওয়াজ দিয়েছে তো! কে রে এরা, চেনা-চেনা লাগছে।"

রতন অপ্রস্তুতের হাসি হেসে বলল, "গানটা আমরা ক'জন মিলে বেঁধেছি। পোটো-পাড়ায় সরস্বতীর সামনে বসে মূর্তি গড়তে-গড়তে সুকুমারদা আইডিয়াটা ঠিক বের করে আনল। তোর দাদা রাগ করবেন না তো পিকলু? সত্যি বলছি, ও'র গানটা আমরা বুঝতে পারিনি।"

কবিদাদা তো এ-কথা শুনে আহ্লাদে আটখানা। এদিকে গোলমাল বেধে গেল ফ্ল্যাটে-ফ্ল্যাটে। পিকলুর চোখের ইশারায় রতন কেটেল ড্রামে কাঠি লাগাল। তাতা, টুকুন আর পিকলু আবার ছায়ামূর্তি হয়ে ছুটল ছাদে ছাদে। মানু গান গেয়ে চলল। খুদেদের দল লেফট রাইট করে রাস্তা চষতে লাগল। ট্রাম, ট্রাম, ট্রাম!

কিছুক্ষণ পরে "হো হো" রবে পাড়া মাত করে টিভি জ্বলে উঠল। "ঠিক হো গিয়া, ঠিক হো গিয়া!"

"কী হল ঠিক বোঝা যাচ্ছে না," অজিতদা স্থির দৃষ্টিতে নিরীহ পিকলুর দিকে চেয়ে রইল, "কী করেছিস রে?"

"কী আবার?"

কবিদাদা হো-হো করে হেসে উঠে বললেন, "কিছু একটা দারুণ হয়েছে। ভেতরে ভেতরে একটা নিদারুণ...কী বলব?"

"বিদ্রোহ?" টুকুন এক নিশ্বাসে জিজ্ঞেস করল।

"সম্ভবত।"

"ক্যু?" এবার তাতার গলা।

"নাঃ।"

পিকলু হাসল, "হাইজ্যাক?"

দাদা আবার প্রাণখোলা হাসি হাসলেন। অজিতদারা যোগ দিল তাতে। "ভাবা যায় না" গোছের হাসি। দাদা বললেন, "টিভির অ্যানটেনাগুলো বলতে পারবে।"

সকলে পিকলুকে চেপে ধরল। "বল না কী করেছিস? কী করে থামালি যন্ত্রগুলো? আবার তো চললও ঠিকঠাক।"

পিকলু, টুকুন আর তাতা সেই অদ্ভুত হাসি-হাসি মুখ করে রইল। এসব জিনিস টপ সিক্রেট। আসল কথা হল মাথা খাটানো।

ঝপ করে আলো নিবে গেল। "লোডশেডিং।"

ব্যস, আওয়াজগুলো অসন্তুষ্ট মুখে অন্ধকারে গা ঢাকা দিতেই মানু উঁচু গলায় বলে উঠল, "পিকলুদাদা, আলো জ্বলবে না?"

"এ আমার ডিপার্টমেণ্ট নয়—বড়দের।"

অন্ধকারে হাত ধরাধরি করে ওরা রতনদের এগিয়ে দিতে গেল।

মানুর দিলদরিয়া গলা ভেসে ভেসে গিয়ে অনেক দূর অবধি শোনা গেল। বানিয়ে বানিয়ে গাইছে—"ও আঁধার আলো হও না, তবে দাদা আওয়াজ দিও না।"

বড় রাস্তায় পাতালরেলের বিরাট ফ্রেমগুলো পর্যন্ত গিয়ে পিকলুরা থামল। এবার ফিরবে। কাজ করতে-করতে ওদের দিকে মজুররা অনেকে তাকালেন, যেমন সাজগোজ, তেমনি গান! কারা এই বাচ্চাগুলো?

রতন ড্রাম বাজিয়ে ওদের কাজে তাল দিতে-দিতে এগিয়ে গেল। "আবার দেখা হবে।"

"আবার দেখা হবে।"

ছবি বিমল দাশ

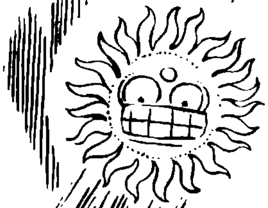

খোঁড়া

সুভাষ মুখোপাধ্যায়

ভাত রুটি খিচুড়ি পোলাও
যাও তুম, ইধার ড্যাডিকো বোলাও।

কাসুন্দি ডাল পোস্তবাটা
লাফিয়ে চলে ঘড়ির কাঁটা।

সুক্তো নিমঝোল পলতার বড়া
ছাতা দাও মাথায়, রোদ্দুর কড়া।

বড়ি পাঁপড় স্যালাড রায়তা
সং সেজেছে, বোঝা যায় তা।

আলুসেদ্ধ বেগুনপোড়া
ঘোড়া দেখে হলি যে খোঁড়া।।

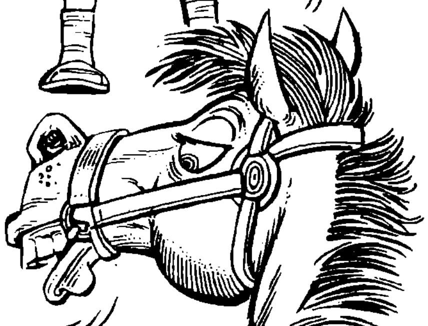

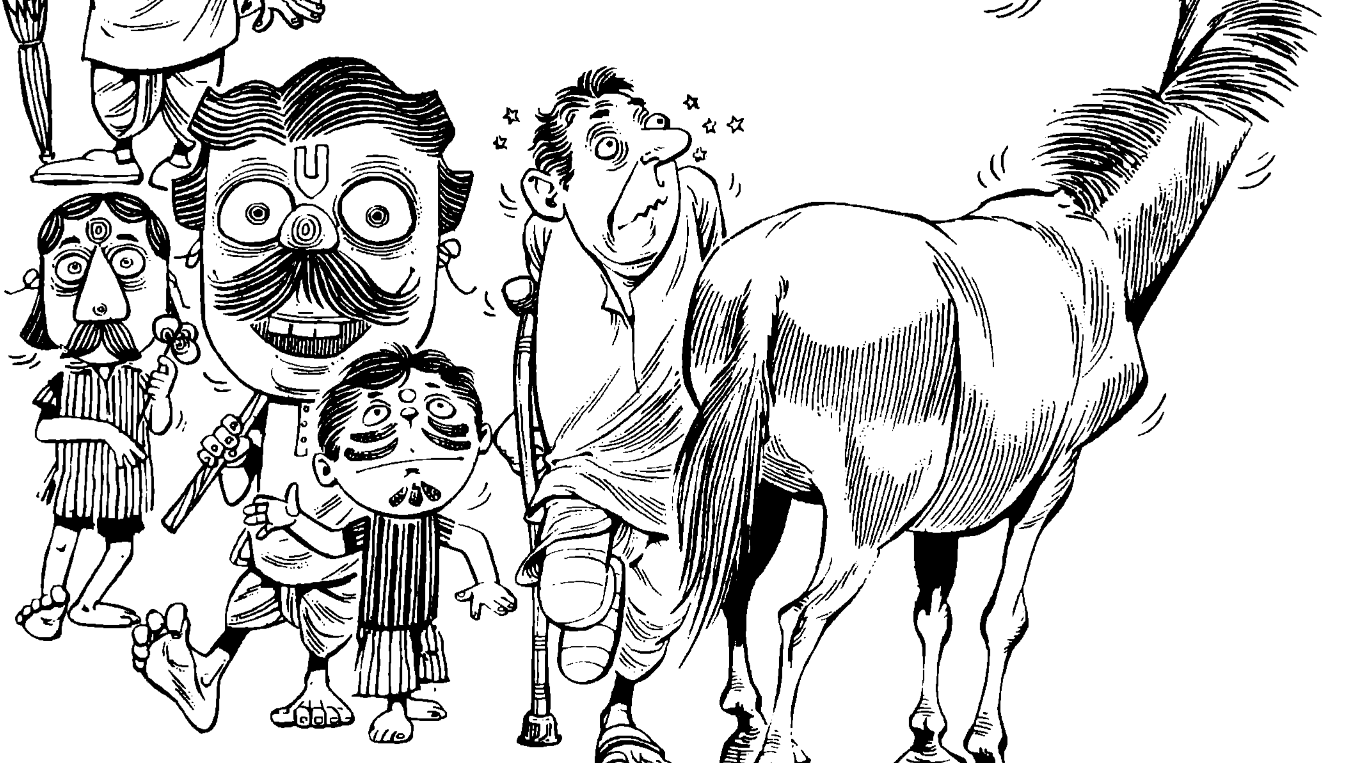

ছবি বিমল দাশ

জেমসের মজার আসর

১০০১ টি পুরস্কার জিতে নাও!

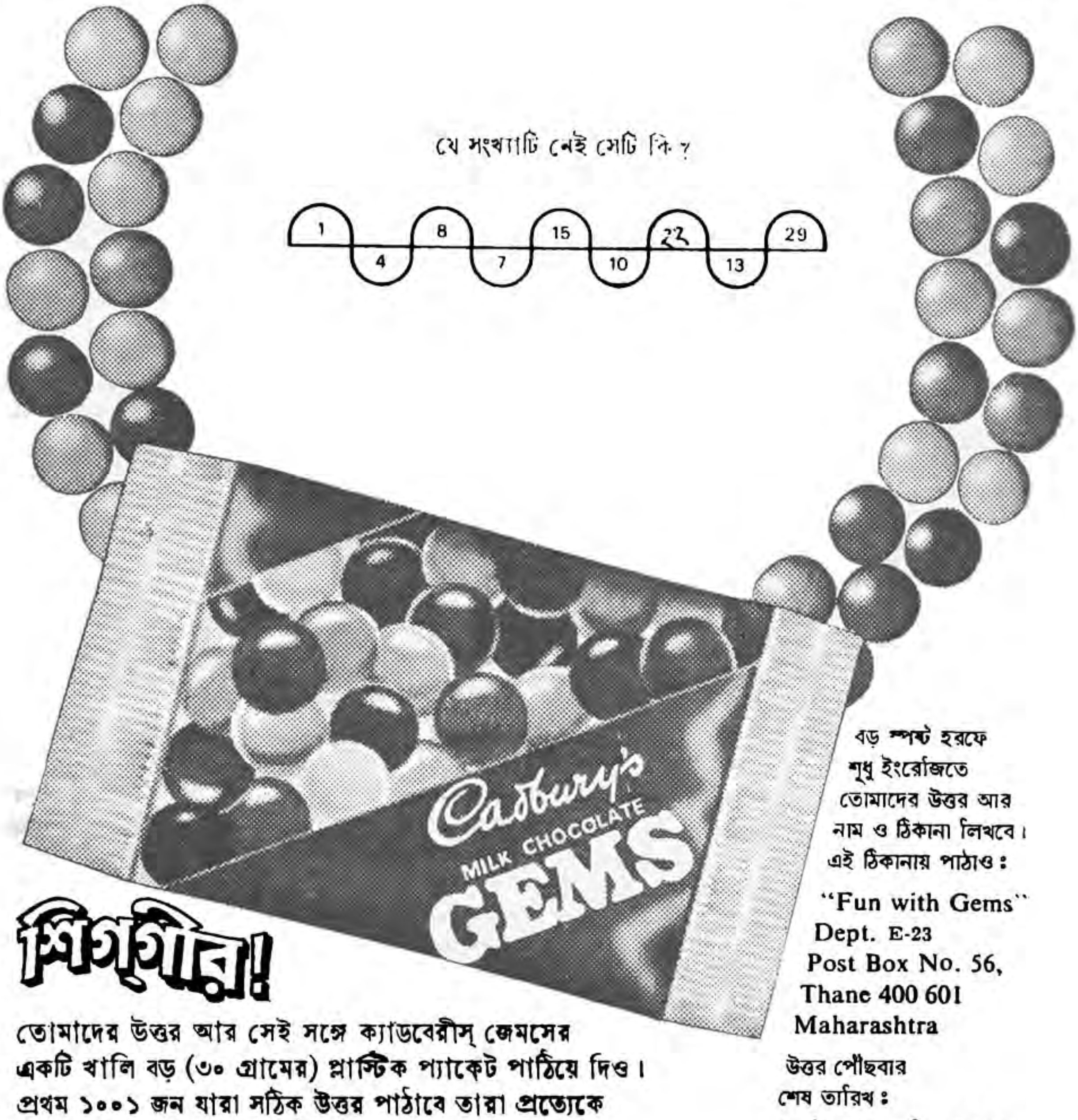

বড় স্পষ্ট হরফে
শুধু ইংরেজিতে
তোমাদের উত্তর আর
নাম ও ঠিকানা লিখবে।
এই ঠিকানায় পাঠাও:

"Fun with Gems"
Dept. E-23
Post Box No. 56,
Thane 400 601
Maharashtra

শিগগির!

তোমাদের উত্তর আর সেই সঙ্গে ক্যাডবেরীস্ জেমসের একটি খালি বড় (৩০ গ্রামের) প্লাস্টিক প্যাকেট পাঠিয়ে দিও। প্রথম ১০০১ জন যারা সঠিক উত্তর পাঠাবে তারা প্রত্যেকে ১১ টাকার স্টেট ব্যাঙ্ক গিফ্‌ট চেক পাবে।

উত্তর পৌঁছবার
শেষ তারিখ:
১২ই জানুয়ারি, ১৯৭৯

রঙ-বেরঙের চকলেটে ভরা ক্যাডবেরীস্ জেমস্

CHAITRA-C-193 BEN

বনবিবির বনে

বুদ্ধদেব গুহ

সুন্দরবনের ছোট বালির পাশে মোটর-বোটটা নোঙর করা আছে। সোঁদরবনের বাঘের জন্যেই এবার আসা। মায়ের প্রচুর আপত্তি ছিল আমাকে আসতে দিতে, কিন্তু বাবার পারমিশানে মায়ের অনিচ্ছা ওভাররুল্ড হয়ে গেছিল। অবশ্য ঋজুদার সঙ্গে না এলে বাবাও সুন্দরবনে আসতে দিতেন কি না সন্দেহ।

ক্যানিং থেকে রাতে বোট রওনা হয়েছিল। সারারাত বোট চালিয়ে পরদিন দুপুরে চামটার কাছে এসে নোঙর করেছি আমরা। সারেঙ ও মাল্লাদের বিশ্রাম ও আমাদের সকলের খাওয়া-দাওয়ার জন্যে। তারপর বিকেল-বিকেল বোট ছেড়ে গভীর রাতে ছোট বালিতে এসে পৌঁছেছিলাম।

বাউলে, মৌলে ও জেলেদের নৌকাগুলো মাঝে মাঝে গহীন দুপুরে এসে লাগে এই ছোট বালিতে। তারপর মুখে উলু দেওয়ার মতো অদ্ভুত আওয়াজ করে জলের কলসি নিয়ে মিষ্টি জলের কুণ্ড থেকে জল তুলে নিয়ে যায় ওরা বড় ভয়ে-ভয়ে। বাঘ যে কোথায় কখন এসে হাজির হবে, তা কেউই জানে না। বনবিবির পুজো দেয় ওরা, বাবা দক্ষিণরায়ের। পায়রা কি পাঁঠা বলি দেয় ঠাকুরের নামে। কোঁচড় ভরে আছাড়ি পটকা নিয়ে ডাঙায় নামে।

কিন্তু সুন্দরবনের বাঘের কাছে এ-সবই আকর্ষণ। বাঘকে দূরে না পাঠিয়ে মানুষের গলার স্বর, আছাড়ি পটকার শব্দ, আরও কাছে টানে। মৃত্যুর কাছে।

বৃষ্টি, কী বৃষ্টি। ঋজুদাই বলছিল, "সুন্দরবনে তো এই নিয়ে বহুবার এলাম গত কুড়ি-পঁচিশ বছরে, কিন্তু শীতকালে এমন বৃষ্টি কখনও দেখিনি।"

বোট থেকে নেমে যাবই বা কোথায়? বোটের খোলা ডেকেও বসা যায় না। হয় সারেঙের বসার জায়গার পিছনে যে জায়গাটুকু আছে সেখানে বসে আড্ডা মারি আমরা, নয়তো খোলের মধ্যে। অবশ্য এ বোটটা ভাল। ছোট্ট। দুটো কেবিন আছে, সঙ্গে অ্যাটাচ্ড বাথরুম। যদিও সুন্দরবন অন্য জঙ্গল নয় যে, ইচ্ছেমতো ঘুরে-ফিরে বেড়াব পায়ে হেঁটে, তবুও কার আর ভাল লাগে টিপটিপে বৃষ্টি আর ঝোড়ো হাওয়ায় বোটের মধ্যে বন্দী হয়ে থাকতে?

খিচুড়ি খাওয়ার এমন পরিবেশ বোধহয় আর হয় না। খিচুড়ি খাও আর কম্বল মুড়ি দিয়ে ঘুম লাগাও।

বোট খুলে নিয়ে এই দুর্যোগে হেড়োভাঙা কি গোসাবা কি মাতলা নদীতে গিয়ে পড়ার বিপদও অনেক। ট্রানজিস্টরে বলেছে যে, তিনদিন অত্যন্ত দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়া চলবে। বঙ্গোপসাগরে নিম্নচাপের সৃষ্টি হয়েছে। আর আমরাও চলে এসে রয়েছি একেবারে বঙ্গোপসাগরের মুখেই। ঋজুদা বোটটাকে একটা সুঁতিখালের মধ্যে দিনের বেলা ঢুকিয়ে রাখতে বলেছিল। রাত হলে আবহাওয়া বুঝে অন্য জায়গায় নতুন নোঙর করা যাবে। রাতের বেলা সুঁতিখালে নোঙর করে থাকা অত্যন্ত বিপজ্জনক এই মানুষখেকো বাঘে-ভরা সুন্দরবনে। অবশ্য রাতের বেলা আমরা ম্যাগাজিনে গুলি পুরে চেম্বার ফাঁকা রেখে রাইফেলকে কোলবালিশ করে শুয়ে থাকি। ঋজুদা হাসতে হাসতে বলছিল, "রাইফেল-কোলে ঘুমন্ত অবস্থায় বাঘের পেটে গেলে সে বড় বেইজ্জতি হবে।"

একই জায়গায় প্রথম দিন প্রথম রাত এইভাবে কাটার পর আমার মাথায় একটা বুদ্ধি এল। ঋজুদাকে বললাম, "ঋজুদা, সঙ্গে আমি টেপ রেকর্ডার এনেছি, বাঘের ডাক, হরিণের ডাক টেপ করার জন্যে। যা দুর্যোগ! বাইরে তো বেরোতেই পারছি না, তার চেয়ে তুমি গল্প বলো, টেপ করি।"

ঋজুদা সবটাতেই ইয়ার্কি মারে। বলল, "আর হনুমানের ডাক টেপ করবি না?"

আমি বললাম, "না।"

ঋজুদা বলল, "গভীর জঙ্গলে হনুমানের ডাক যারা শোনেনি, তারা ঐ ডাক শুনেই বাঘ বলে ভাববে। তুই সেফ্লি হনুমানের ডাক টেপ করে নিয়ে যা। যা ঠান্ডা আর বৃষ্টি, বাঘেদের গলা ভাল না-থাকারই কথা। যদি না ডাকে, তার চেয়ে যা বললাম, তাইই কর।"

তারপরই বলল, "একবার উত্তরবঙ্গের বৈকুণ্ঠপুরের জঙ্গলের গভীরের এক গ্রামে গরু ডাকছিল, সেই ডাক টেপ করেছিলাম। কলকাতার আমার দাদার এক ব্যারিস্টার বন্ধু নাকি খুব শিকার-টিকারে যেতেন আর আলো-জ্বলা ড্রইংরুমে বসে দাদা-বৌদির কাছে হাত নেড়ে কান নেড়ে গল্প করতেন। একদিন তিনি যখন এসেছেন দাদা বৌদির কাছে, আমি টেপটা বাজালাম। জাঁদরেল গরু তার বাজখাঁই গলায় ডাকছিল হাম্বা—আ—আ। গভীর জঙ্গলের মধ্যে বৃষ্টিভেজা গাছপালার মধ্যে প্রতিধ্বনিত হয়ে সে ডাক গমগম করে উঠছিল। দাদার ব্যারিস্টার বন্ধু মনোযোগ দিয়ে ডাকটা শুনলেন বারকয়েক, তারপরই বৌদির দিকে বিস্ফারিত চোখে চেয়ে বললেন, বুঝলে? কী বুঝলে ম্যাডাম? দাদা-বৌদিকে কখনও ও টেপ শোনাইনি আগে। বৌদি চোখ বড় বড় করে বললেন, কী? কোন্ জানোয়ার? কুমির? ব্যারিস্টার দাদা বললেন, ধুৎ, কুমিরের ডাক আনক্যানি। এটা বাঘিনীর ডাক। সঙ্গীকে ডাকছে।"

আমি হো-হো করে হেসে উঠলাম।

ঋজুদা বলল, "হেসো না। জঙ্গলের ভিতরের গ্রামের গরুর ডাক ফেলনা নয়।"

আমি বললাম, "ঋজুদা, এই করে কিছুই হচ্ছে না। সময় চলে যাচ্ছে। আমি কিন্তু টেপ করছি, তুমি গল্প বলো, তোমার নানান জায়গায় শিকারের গল্প।"

ঋজুদা পাইপটা থেকে ছাই ঝেড়ে বলল, "বলিস কী? আমি কি জিম করবেট? বেশি গ্যাস দিস না আমাকে। তোকে তো এমনিতেই সব জায়গায় নিয়ে আসি। তবে আর কেন? আমার আবার গল্প, তাও আবার টেপ করবি। কেন, আর লোক পেলি না?"

আমি বললাম, "তুমি কথা ঘোরাচ্ছ। যতদিন...মানে এই দুদিন তো দুর্যোগে বোটের মধ্যেই আটকা... বলোই না বাবা। প্লীজ, তুমি গল্প বলো। তোমারও পুরনো কথা সব মনে পড়ে যাবে—আর আমারও শোনা হবে গল্প।"

তারপরই কী মনে হওয়ায় আমি বললাম, "তাহলে, তোমার জেঠুমণির গল্প বলো। দারুণ লেগেছিল সেই কানা বাঘের গল্পটা। তোমার, তোমার জেঠুমণির যা-যা মজার-মজার গল্প আছে, সব বলো, প্লীজ।"

ঋজুদা পাইপটা ধরিয়ে, আমাকে বলল, "গদাধরকে বল তো চায়ের জল চড়াবে। আর হ্যাঁ, সঙ্গে পাঁপড় ভাজতে বল। তারপর বলল, আজ রাতে ভুনি-খিচুড়ি পেলে কেমন হয় বল তো? একটু বাদাম কড়াইশুঁটি ছাড়িয়ে, মুগের ডালের খিচুড়ি একটু ঘন করে, সঙ্গে ডিমের বড়া, পেঁয়াজি আর শুকনো-লংকা ভাজা।"

আমি বলে উঠলাম, "আঃ। আর বোলো না, আর বোলো না, গন্ধ পাচ্ছি।"

ঋজুদা বলল, "তাইই বলে আয় গদাধরকে। শুকনো-কড়াইশুটি কি আছে আমাদের সঙ্গে?"

আমি বললাম, "সব আছে। নেই কী। তুমি তো জেঠুমণিরই ভাইপো। তুমিই বা কম কী?"

ঋজুদা বলল, "ফার্স্ট ক্লাস। এখন গদাধরকে চায়ের কথাটা বলে দিয়ে চলে আয় দেখি। এক চামচ চিনি, দুধ কম, মনে আছে তো?"

আমি বললাম, "শুধু আমার কেন, আমার বন্ধুদেরও মুখস্থ হয়ে গেছে যারা তোমার বই পড়েছে। তুমি বেশ খাদ্যরসিক আছ বাবা। আমার এক বন্ধুর মা বলেছেন।"

ঋজুদা বলল, "যাঃ ভাগ। বলেছেন তো বলেছেন। তা বলে ভাল-ভাল জিনিস খাব না?"

রাতের খাওয়ার অর্ডার আর চায়ের কথা বলে আমি ফিরে, এসে আসন করে বসলাম সারেঙের ঘরে পাতা গদিতে একটা বালিশ কোলে নিয়ে।

ঋজুদা দূরে তাকিয়ে ছিল। জলের উপর দিয়ে এক ঝাঁক কার্লু উড়ে যাচ্ছিল দ্রুত ডানায়। খালের ওপর থেকে হরিণ-গুলো ডাকছিল টাঁউ-টাঁউ করে।

ঋজুদার চোখে তাকিয়ে আমার সমস্ত মনটাও যেন প্রশান্ত হয়ে এল। এই সুন্দরবনের নির্জন, ভিজে, ভয়-ভয়, অসামান্য প্রাকৃতিক সৌন্দর্য যেন ঋজুদার চোখে ক্যামেরার লেন্সের মতো ছায়া ফেলেছে। বড় ভালবাসে প্রকৃতিকে মানুষটা। ভাবলেও ভাল লাগে। আমি যদি আই এ এস পরীক্ষায় বসি বড় হয়ে, তাহলে ফরেস্ট সার্ভিসে যাব। যে একবার জঙ্গলের আর প্রকৃতির কাছে থেকেছে, সে কি জঙ্গল ছেড়ে থাকতে পারে?

ঋজুদা যখন চোখ ফেরাল বাইরে থেকে, আমি বললাম, "বলো ঋজুদা।"

ঋজুদা যেন অনেক দূরে চলে গেছিল। এই বৃষ্টি-ভেজা নদী, জঙ্গল, দূরে ঝাপসা দিগন্তের বঙ্গোপসাগরের দিকে চেয়ে ঋজুদা যেন অন্য কারো কথা ভাবছিল। অথবা প্রকৃতির মধ্যেই বোধহয় ঋজুদা কাউকে দেখতে পায়, বুঝতে পারি না। কাছা-কাছি থেকেও ঋজুদাকে মাঝে-মাঝে একেবারেই বুঝতে পারি না। কিছুক্ষণের জন্যে দূরে—বড়ই দূরে চলে যায়। তখন চোখের দিকে তাকালে মনে হয় কী যেন গভীর দুঃখ কাজল হয়ে তার চোখে চোখে লেগেছে।

আমি বললাম, "শুরু করো।"

ঋজুদা আমার কাছে ফিরে এল। আবার সেই হাসিখুশি, রসিক মানুষটা। বলল, "শোন, তাহলে, শুরু করি।" তারপর বলল, "তুই একটা দামি কথা বলেছিসঃ গল্প বলতে-বলতে আমারও অনেক পুরনো কথা মনে পড়ে যাবে। ছেলেবেলায় ফিরে যাব। এটা কম কথা নয়।" তারপর একটু চুপ করে থেকে বলল, "আমার গল্প নাই-ই বা শুনলি, ইচ্ছে আছে, পরে কখনও ডায়রির মতো করে লিখব। তার চেয়ে জেঠুমণির গল্প শোন।"

ঋজুদা গল্প বলতে শুরু করল...

"জেঠুমণি কলকাতার নামজাদা ব্যারিস্টার। ভারতবর্ষের নানা জায়গায় তাঁর সব বড় বড় মক্কেল ছড়িয়ে ছিটিয়ে আছে। একবার যাব বললেই হল। খাতির-যত্ন, আদর-আত্তির অভাব নেই। তবে বিগ-গেম শুটিং-এর শখ জেঠুমণির মাঝ-বয়সে হয়। তার আগে ফেদার-শুটিং করতেন। মানে পাখ-পাখালি আর কী! জেঠুমণির হাত ছিল দারুণ। বন্দুকে ফ্লাইং মারতেন পটাপট্। পাখি উড়েছে কি মরেছে। রাইফেলেও ভাল নিশানা ছিল জেঠুমণির। পয়েন্ট টু টু ওপেন রাইফেল দিয়ে, ম্যাচ রাইফেল নয়, পঁচাত্তর গজ দূরে আমি জেঠুমণিকে দেখেছি গ্যাঁদাফুলের পাঁপড়ি ছিঁড়তে এক-এক করে।

"সবচেয়ে বড় কথা ছিল এমন রসিক দিল-খোলা ও উদার লোক আমি কমই দেখেছি। মানুষজন ভালবাসতেন ভীষণ। যখনই শিকারে যেতেন, সঙ্গে যেত মস্ত দল। অনেকেই তাঁর শিকার-পার্টিকে তাই যাত্রা-পার্টি বলত। কিন্তু জেঠুমণি দম-বার লোক ছিলেন না। সকলকে নিয়ে যা আনন্দ, তাতেই তিনি মজা পেতেন।

"আমাকে জেঠুমণি খুব ভালবাসতেন ছোটবেলা থেকে। জেঠুমণির বড় ছেলে, মানে আমাদের বড়দা একটু কবি-কবি গোছের লোক ছিলেন। জেঠুমণি তাঁর নাম দিয়েছিলেন হোঁদল-কুতকুত। বড়দাদা শিকারে গিয়ে কবিতার খাতা নিয়ে বসতেন কি ছবি আঁকতেন। জেঠুমণি ব্যক্তিস্বাধীনতায় হস্ত-ক্ষেপ করতেন না, কিন্তু বড়দাদার কবিত্বের কারণে আমিই জেঠুমণির অনেক কাছের ছিলাম। বড়দাদা শিকার-টিকারে বড় একটা যেতেও চাইতেন না, তাঁর রবীন্দ্রসঙ্গীতের স্কুল কামাই হবে বলে।

"জেঠুমণির এক বড় মক্কেল, ক্রিশ্চিয়ান মাইকা কোম্পানি, কোডারমার, জেঠুমণিকে নেমন্তন্ন করল শিকারে যেতে। ঝুমরি-তিলাইয়ার উল্টোদিকে কোডারমা শহর। কোডারমা স্টেশন থেকে বেশ কিছু দূরে শিবসাগর। পুরোটাই ক্রিশ্চিয়ান মাইকা কোম্পানির এলাকা। তখন তাদের যে গেস্ট হাউস ছিল, তার নাম ছিল পাঁচ-নম্বর বাংলো। তখন সবে সাহেবরা কোম্পানি বিক্রি করে দিয়েছে এখনকার মালিকদের কাছে। বিরাট শালবন ছিল বাংলোর কম্পাউন্ডে। বেয়ারা, বাবুর্চি, স্টুয়ার্ড, সহিস, ঘোড়া, গাড়ি, জীপ, ওয়েপন-কেরীয়ার—কিছুরই অভাব ছিল না।

"যথারীতি জেঠুমণি তাঁর বহু চেলা-চামুণ্ডা নিয়ে একদিন সকালে তো কোডারমা স্টেশনে ট্রেন থেকে নামলেন সঙ্গে দাশকাকু, অহীনকাকু, বঙ্কীকাকু, সমীরকাকু, গবুকাকু আর আমি তো আছিই।

"তখন শিকারও ছিল সে-সব জায়গায়। বিখ্যাত-বিখ্যাত সব জঙ্গল। চৌঁড়াখোনা, শিঙ্গার, ইটখোরি-পিতিজ, রাজৌলির ঘাট, আরও কত কী জঙ্গল। প্রচুর খাওয়া-দাওয়া হৈ হৈ। বিকেলে হান্টলি পামার বিস্কিট দিয়ে চা খাওয়া হত আহা! সেই বিস্কিটের স্বাদ এখনও মুখে লেগে আছে। গত বছর লন্ডনে গিয়ে খেয়েছিলাম বহুদিন পর।

"যাই-ই হোক, অহীনকাকু অন্য দলের লীডার হলেন। অহীনকাকুর চেহারাটা ছোট-খাটো, কিন্তু অমন বিদ্বান, বুদ্ধিমান, রসিক ও সাহসী মানুষ খুব কমই দেখা যায়। তিনি বললেন, দাদা, আমি গবুদের নিয়ে রাজৌলির ঘাটে যাচ্ছি। আপনি দাশ সাহেবকে নিয়ে যান। দলের মধ্যে দাশকাকুই সবচেয়ে সাহেব। যেমন সাহেবের মতো দেখতে, মুখে পাইপ, তেমনি আস্তে-আস্তে চোস্ত ইংরিজি-মেশানো বাংলা বলেন। ইন ফ্যাক্ট পাইপ খাওয়ার বাসনাটা আমার দাশ-সাহেবকে দেখেই হয় ছোট বেলায়—যদিও ভগবান চেহারাটা দাশ-সাহেবের মতো দেননি। সবে বিয়ে করেছেন দাশকাকু। একটি ছেলে, এক বছর বয়স।

"আসল ব্যাপার, দাশকাকু কট্টর সাহেব বলে অহীনকাকুরা তাঁকে জেঠুমণির জিম্মায় দিয়ে বিকেল-বিকেল বেরিয়ে গেলেন। তাঁদের অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত ওয়েপন-ক্যারীয়ার দেখে মনে হল শিকার তো নয়, যুদ্ধযাত্রায় চলেছেন তাঁরা। জেঠুমণির স্ট্যান্ডিং অর্ডার—জানোয়ার চেহারা দেখিয়ে যেন পালিয়ে না যেতে পারে। একসঙ্গে ফায়ারিং স্কোয়াডের মতো গুলি করে তাকে ধরাশায়ী করা চাইই চাই!

"আমি জেঠুমণি আর দাশকাকুর সঙ্গে জীপে বেরোলাম

অন্য দিকে। জেঠুমণি সামনে বসেছেন জীপের। ড্রাইভার মহম্মদ হুসেন। পিছনে আমি এবং দাশকাকু। দাশকাকুর হাতে দোনলা শটগান। আমার হাতে পয়েন্ট টু-টু রাইফেল। জেঠুমণির হাতে পয়েন্ট ফোর-নট-ফাইভ সিংগল ব্যারেল রাইফেল। আণ্ডার লিভার। প্রত্যেকবার গুলি করে ঘ্যাটা-টং আওয়াজ করে নীচের লিভার টানাটানি করে রি-লোড করতে হয়।

"জীপের পকেটে গোটা চল্লিশ মঘাই পান, আর খুশবুভরা জর্দা। শিকার যাত্রার আগে কোডারমা শহরে গাড়ি ছুটিয়ে গিয়ে স্পেশাল অর্ডার দিয়ে যুগল এই পান নিয়ে এসেছে। যুগলই আমাদের গাইড, স্পটার, সব। তার চেহারাটা দারুণ। লম্বা চওড়া। গোঁফ আছে ইয়া বড়। শীত গ্রীষ্ম সব সময় তার পোশাক হল একটা গামবুট, তার উপরে একটা ওয়াটার-প্রুফ। শীতে অবশ্য ওয়াটার প্রুফের নীচে গরম পুলওভারও থাকত। মাথায় কোন সাহেবের দিয়ে যাওয়া একটা নীল রঙা ফেল্ট-হ্যাট।

"জীপ ছাড়ল সন্ধের মুখে-মুখে। দেখতে দেখতে জঙ্গলে ঢুকে পড়লাম আমরা। শীতকাল। জেঠুমণির ওজন দেড় কুইন্টাল—গায়ে মোটা কালো ওভারকোট—মাথায় বাঁদুরে টুপি। কিছুক্ষণ বাদে জেঠুমণি ঘাড় ঘুরিয়ে কষ্ট করে দাশকাকুর সঙ্গে কথা বলছেন, কথা বলার সময় তাঁর মুখ দিয়ে রাশান সামো-ভারের মতো ধোঁয়ার কুণ্ডলি বেরোচ্ছে ঠাণ্ডায়। তার সঙ্গে দাশ-কাকুর থ্রী-নান টোব্যাকোর ঠাসা পাইপের স্টীম-বয়লারের মতো নিরন্তর ধোঁয়া। আরও ছিল যুগলের ঘন-ঘন দু হাতে খৈনি মেরে খাওয়া। আমার তো প্রাণ যায়-যায়।

"এমন সময় হঠাৎ ধূলিধূসর ঢোঁড়াখোলার পথে একটি নির্বোধ, প্রাণভয়হীন শশকের আবির্ভাব হল।"

আমি বললাম, "এই ঋজুদা, সংস্কৃত বোলো না, প্লীজ। আমি সংস্কৃতে পনেরো পেয়েছিলাম।"

"লজ্জার কথা।" ঋজুদা বলল, "শশক মানে খরগোশ, র‍্যাবিট, হেয়ার। বুঝলি তো?"

আমি বললাম, "হ্যাঁ হ্যাঁ, বলো।"

ঋজুদা বলল, "খরগোশ জীবনে হাজার হাজার দেখেছি· শয়ে শয়ে মেরেছি, কিন্তু ঐ খরগোশের কথা জীবনে ভুলব না। খরগোশটা বোধহয় খরগোশদের স্পোর্টসে থ্রি-লেগেড রেসে ফার্স্ট হয়েছিল। এমন অদ্ভুতভাবে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে চার পা তুলে তুলে লাফাতে লাফাতে জীপের সামনে-সামনে দৌড়চ্ছিল যে কী বলব!

"খরগোশ দেখেই যুগল বিরক্তির সঙ্গে বলল, মানহুস।"

"মানহুস আবার কী ঋজুদা?" আমি শুধোলাম।

"আহা, মানহুস মানে জানিস না?" অধৈর্য গলায় ঋজুদা বলল, "মানহুস মানে অপয়া। শিকারে বেরিয়ে প্রথমে কী জানোয়ার পড়ে না পড়ে তার উপর নির্ভর করে সেদিনকার শিকারের ভাগ্য। জায়গা বিশেষে এই পয়া-অপয়া বদলে যায়। কোথাও শেয়াল মানহুস, কোথাও খরগোশ, কোথাও বনবেড়াল, এইরকম আর কী।"

আমি বললাম, "বলো, তারপর বলো।"

"খরগোশ দেখে জেঠুমণি জীপের পকেট খুলে আরো চারটে পান মুখে দিলেন। তারপর রুপোর তৈরি মনোগ্রাম-করা জর্দার কৌটোটা হাতখানেক উঁচু করে উপর থেকে যেই মুখে জর্দা ফেলছেন টিপ করে, অমনি মাহমুদ হোসেন কী অনিবার্য কারণে ব্রেক কষল জীপের। ফলে, কাশীর জর্দা জেঠুমণির মুখে না পড়ে সটান আমারই উত্তেজিত হাঁ-করা মুখে। বোঝ একবার। স্পেশ্যাল বেনারসী জর্দা—বেনারস থেকে জেঠুমণির মক্কেল পাঠায় যত্ন করে। কী হল বোঝার আগেই তো গিলে ফেললাম। তারপরই খেলা শুরু। জীপ চলতে দেখি, পথের উপরে একটা নয়, শত শত শশক। লাফাতে লাফাতে চলেছে।

"জেঠুমণি অডার দিলেন প্রধান অতিথিকে, মারু দাশ।

"দাশকাকু পাইপটা মুখে ধরেই চলমান জীপ থেকে লম্ফমান খরগোশের উদ্দেশে আই-সি-আই কোম্পানির তৈরি একটি চার নম্বরের ছররা দিলেন। নৈবেদ্য যথাস্থানে পৌঁছল না। খরগোশটা বোধহয় বলল, 'খেলব না কিন্তু।' বলেই জোরে একটা লাফ দিয়ে উঠেই আবার এক্কা-দোক্কা খেলার মতো জীপের সামনে লাফাতে-লাফাতে চলল। পথ ছেড়ে যে প্রাণ বাঁচাতে এদিকে কি ওদিকে জঙ্গলে ঢুকে যাবে তা নয়। 'ছোড়িস না। আবার মার'।' জেঠুমণির অর্ডার হল।

"আবার গুলি হল। আবার বোধহয় 'ভাল হচ্ছে না কিন্তু' বলে খরগোশটা একটা বড় লাফ দিয়ে উঠে যেমন চলছিল তেমন লাফাতে-লাফাতে একবার ডাইনে একবার বাঁয়ে চলতে লাগল।

"জেঠুমণি আবার বললেন, বেইজ্জত। পরক্ষণেই বললেন, মার, দাশ, ছাড়িস না।"

"দমাদ্দম গুলি হতে লাগল। দাশকাকু বন্দুক রিলোড করেন আর মারেন। খরগোশ লাফায় আর লাফায়, আর জীপের সামনে সামনে চলে।

"জেঠুমণি নেহাত দাশকাকুর বেলাতেই এবং খরগোশের মতো ছোট জানোয়ার বলেই এমন একক শিকারের সম্মানের অধিকার দিয়েছিলেন। অন্য দল হলে এবং অন্য দিন হলে ফায়ারিং স্কোয়াডের সামনে পড়ে খরগোশ ততক্ষণে কাবাব হয়ে যেত।"

"এবার জেঠুমণি তাঁর সাধের ভাইপোকে বললেন, তুই মার, ঋজু।

"কিন্তু আমি তখন কি আর ঋজু আছি? জর্দা খেয়ে বনবন করে মাথা ঘুরছে। পথময় খরগোশ। ডানদিকে, বাঁদিকে, উপরে, নীচে। বেনারসী জর্দাটা বড় কড়া ছিল।

"কিন্তু জেঠুমণির অর্ডার। আমিও কর্তব্য করে যেতে লাগলাম, পটাং পটাং করে। ম্যাগাজিনের দশটা গুলি, দশটাই শেষ। দাশকাকুও খোটা দশেক গুলি করে দেখি ডান হাতে বাইসেপসের গোড়ায় বাঁ হাত দিয়ে মালিশ করছেন। দড়কচ্চা মেরে গেছে হাত।

"এদিকে জেঠুমণির যা রাইফেল, তা বাঘ কি সম্বর কি ভাল্লুক মারার। ঐ রাইফেল দিয়ে খরগোশ মারলে প্রথমত খরগোশকে খুঁজে পাওয়া যাবে না, দ্বিতীয়ত রাইফেলের অসম্মান করা হবে। কিন্তু খরগোশটারও ধৃষ্টতার সীমা থাকা উচিত।

"পিছনে বসে আমি ও দাশকাকু সবিস্ময়ে দেখলাম যে, জেঠুমণি রাইফেল কাঁধে ওঠালেন।মাহমুদ হোসেন মৃদু আপত্তি করতে গেল। বলল, ছোড়িয়ে হুজৌর। ইসকা আজ মওত নেহি হ্যায়।

"অর্থাৎ ছেড়ে দিন হুজুর, এর আজকে মৃত্যু নেই।

"পিছন থেকে জেঠুমণির অনুগত অনুচর যুগল বলল, আজ ইসকো খতম করেগা।

"এমন সময় হতভাগা গুলিখেকো খরগোশটা নির্বুদ্ধিতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে হঠাৎ রাস্তার ডানদিকে চলে গিয়ে একেবারে জীপের সামনেই একটা শাল গাছের গুঁড়ির আড়ালে লুকিয়ে পড়তে গেল।"

ঋজুদা একটু চুপ করে থেকে তারপর বলল, "খরগোশরা এরকম করেই লুকোয়। তুই নিশ্চয়ই লক্ষ করেছিস, জঙ্গলে, বিশেষ করে রাতে, ওদের গায়ে আলো পড়লে ওরা এইভাবে গা-ঢাকা দিতে চায়। মুখটা গাছের আড়ালে লুকিয়েই ও ভাবল বুঝি খুব লুকিয়েছে। সমস্ত শরীরটা যে বাইরে আছে, সে-হুঁশ নেই। হুঁশ থাকলে মরতে যাবে কেন?

"জেঠুমণি সোরিমানিয়াসজি রাইফেলের ব্যারেলটা একেবারে খরগোশের গায়েই প্রায় ঠেকিয়ে গদ্দাম করে দেগে দিলেন। আমার মনে হল প্রলয়কাল সমুপস্থিত। ধুলোর মেঘে ধরণী অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকার হবার আগে দেখলাম খরগোশটা লাফিয়ে উঠে চিংপটাং হয়ে পড়ে গেল। তখনও জর্দার নেশা ছিল আমার। কী করে দেখলাম জানি না।

"এতক্ষণে দাশকাকু কথা বললেন। বললেন, আরে এ তো একেবারে ছেদড়ে-ভেদড়ে গেছে, এ নিয়ে গিয়ে কী করবে? কাবাব পর্যন্ত হবে না।

"জেঠুমণি বিজয়োল্লাসে আরো চারটে পান খেয়ে বললেন, আজকের পয়লা শিকার। একে তো স্টাফ করে রাখব আমার স্টাডিতে। যে কাণ্ড এ করল, যতগুলি গুলি খরচ করাল, তাতে তো এই খরগোশ লেজেণ্ডারি হয়ে গেছে।

"যুগল বলল, এ মাহমুদ ভাইয়া, জলদি উঠা লে উসকো—সামনেমে টাইগারকা চান্স হ্যায়।

"দাশকাকু বেশ শান্তমনে খরগোশের দিকে তাকিয়ে ছিলেন।

"হঠাৎ উত্তেজিত হয়ে বললেন, টাইগার? মানে বাঘ?

"যুগল বলল, জী হুজৌর। রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার।

"দাশকাকু জেঠুমণিকে সঙ্গে-সঙ্গে বললেন, গাড়ি ঘুরাও।

"জেঠুমণি বললেন, ছাড় তো ওদের কথা। বাঘ বললেই বাঘ? অত সহজে বাঘ দেখা গেলে তো হতই।

"দাশকাকু বললেন, সহজে না হোক, কঠিনেও দরকার নেই। চারদিক খোলা, হুড-নামানো উইণ্ড-স্ক্রীন-নামানো জীপে বসে এ কী ছেলেখেলা?

"জেঠুমণি ঠাণ্ডা গলায় বললেন, আরে দাঁড়া, উত্তেজিত হচ্ছিস কেন? খরগোশটাকে তুলে নিক।

"মাহমুদ হোসেন জীপটাকে স্টার্টে রেখেই, জীপের বাঁদিকের স্টীয়ারিং ছেড়ে নেমে জীপের সামনেটা ঘুরে গিয়ে খরগোশটাকে তুলবে বলে যেই তার পায়ে হাত দিল, অমনি খরগোশটা ওর হাতে আঁচড়ে দিয়ে তড়াক করে এক লাফে জঙ্গলে উধাও।

"জেঠুমণির মুখের পান আর গলায় নামল না।

"যুগল মিটিমিটি হাসতে লাগল, জেঠুমণির উপস্থিতি অগ্রাহ্য করে। তারপর কিংকর্তব্যবিমূঢ় মাহমুদ হোসেনও হেসে উঠল। তারপর আমি। শেষে দাশকাকু ও জেঠুমণিও।

"কতক্ষণ পরে আমাদের হাসি থামল তা আজ আর মনে নেই।

"খরগোশটার গায়ে গুলি লাগেনি। কিন্তু অত কাছে অত হেভি রাইফেলের গুলি পড়ায় সে ভয়ে আর আওয়াজে অজ্ঞান হয়ে গেছিল।

"মাহমুদ হোসেন স্টীয়ারিংয়ে ফিরে এসে আবার অ্যাকসিলারেটরে চাপ দিল।" (ক্রমশ)

খেলতে খেলতে

চুনী গোস্বামী

॥ ১৫ ॥

আটান্নয় টোকিও এশিয়ান গেমসে ভারতের ফুটবল দলে স্থান পাবার জন্য শুধু কলকাতার কত দাবিদার ছিল দ্যাখো।

ইস্টবেঙ্গলে ছিল রামবাহাদুর, বীর বাহাদুর, হাসান, নারায়ণ, বলরাম, কানন, বালসুব্রহ্মনিয়াম। মোহনবাগানে রহমান, কেম্পিয়া, বদরু ব্যানার্জি, আমি। মহমেডান স্পোর্টিংয়ে মুস্তাক আমেদ, গফুর, মহম্মদ আলী, রহমতুল্লা, ওমর ইয়ামানি। রাজস্থান ক্লাবে সালাম, দামোদরন, মোরি, ম্যাসি, রামেশ্বর। এবং ইস্টার্ন রেল দলে পি বর্মন, নিখিল নন্দী, তাপস সোম, পি বসু, অসীম সোম ও পি কে। তোমরাই বলো, কলকাতায় তখন সত্যিই ফুটবলের আসর একেবারে জমজমাট কি না?

ওই আটান্নয় রহমতুল্লা ও নারায়ণের ফর্ম ছিল চমৎকার। বলরামের তো ছিলই। তবে ফুটবল বিশেষজ্ঞ অনেকেই বলতেন এবং এখনো বলেন, নারায়ণ যদি নিজের স্বাস্থ্য এবং খেলা সম্পর্কে আর একটু আগ্রহী হত তবে বলরামের চেয়ে বেশি নাম করতে পারত। আমরা অবশ্য ঠিক তা কখনও ভাবিনি। তবে হ্যাঁ, সত্যিই ট্যালেন্টেড ইনম্যান ছিল নারায়ণ। আজকালকার দিনে হলে স্ট্রাইকারের ভূমিকায় ও হয়তো আরও ভাল খেলত। আন্তরিকতা এবং নিষ্ঠার অভাবে ফুটবল-মাঠ থেকে অল্পদিনের মধ্যে সরে গেল। প্র্যাকটিসে মোটেই আগ্রহ ছিল না। ভীষণ আয়েসি ছিল। দিনের বেলাতেও ঘুমোত এবং খেলার দিন ঘুম থেকে উঠে মাঠে আসত। শুধু ট্যালেন্ট থাকলেই তো হয় না। তার পরিবর্ধন ও পরিমার্জনের জন্য চাই অনুশীলন, অধ্যবসায় এবং সাধনা।

যাই হোক, সামনে এশিয়ান গেমস ছিল বলেই সে-বছর সবাই নিজের খেলা সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন ছিল। আমিও সতর্ক ছিলুম যাতে বলরাম, নারায়ণ, রহমতুল্লা আমাকে ডিঙিয়ে না যেতে পারে। মাঝ-মরসুমে বুলগারিয়া থেকে একটি দল এল কলকাতায় খেলতে। দলটি বেশ শক্তিশালী ছিল। আই এফ এ একাদশকে কিন্তু বুলগারিয়া দল হারাতে পারেনি। আমরা দারুণ লড়েছিলুম। খেলাটি গোলশূন্য অবস্থায় শেষ হয়েছিল।

ওই বছর আমি পাই বেস্ট ফুটবলারের ট্রফি। শুনেছিলুম সারা মরসুমের খেলা ছাড়াও বুলগারিয়া দলের বিরুদ্ধে আমার খেলা নির্বাচকদের মনের উপর যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করেছিল।

আমি মনে করি, বেস্ট ফুটবলারের ট্রফিটি প্রতীক, সম্মানটি অনেক বড়। অতীতের নামী খেলোয়াড়দের নিয়ে গড়া ভেটারেন্স ক্লাব, যার সভাপতি ছিলেন স্বনামধন্য গোষ্ঠ পাল, পরিচালকদের মধ্যে ছিলেন অতীত দিনের সব বাঘা বাঘা খেলোয়াড়, তাঁদের বিচারে "ফুটবলার অব দা ইয়ার" হওয়া মস্ত গৌরবের কথা। ক্রীড়া দক্ষতা তো বটেই, ওরা তার সঙ্গে বিচার করেন মাঠে ও মাঠের বাইরে খেলোয়াড়ের আচার-আচরণ।

উনিশশো ছাপ্পান্ন সাল থেকে ভেটারেন্স ক্লাব বেস্ট ফুটবলার নির্বাচন করে আসছেন। ছাপ্পান্নয় এই সম্মান পেয়েছিল নিখিল নন্দী, সাতান্নয় সালাম। আটান্নয় পেলাম আমি।

আমার নিজের কথা কিছু বলতে চাই না। নিখিল নন্দী এবং সালামের নির্বাচন সম্পর্কে বলতে পারি, এমন নিখুঁত এবং নির্ভুল বিচার তাঁরাই করতে পারেন, যাঁরা ফুটবল-জ্ঞানে সমৃদ্ধ এবং মরসুমের খেলার সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত। যে দুই মরসুমে সালাম ও নিখিল "ফুটবলার অব দা ইয়ার" হয়, সে দুই মরসুমে খেলার দিক দিয়ে ওদের শ্রেষ্ঠত্ব নিয়ে যেমন কোনো প্রশ্ন ওঠে না, তেমন মাঠের মধ্যে এবং মাঠের বাইরে ওদের আচার-ব্যবহার ছিল আদর্শ খেলোয়াড়ের মতো।

খেলাধুলায় পিতা-পুত্র এবং তিন-চার ভাইয়ের অনেক কীর্তির কথা তোমরা শুনেছ। নিশ্চয়ই শুনেছ ক্রিকেটে পাকিস্তানের মহম্মদ ভাইদের কীর্তির কথা। ওয়াজির, রাইস, হানিফ, মুস্তাক ও সাদিক—এই পাঁচ ভাইয়ের মধ্যে রাইস ছাড়া চারজনই তো নামী টেস্ট ক্রিকেটার। ফুটবলে বাংলার নন্দী ভাইদেরও আছে এক গর্বের রেকর্ড। বড় ভাই অজিত নন্দী উনিশশো আটত্রিশ সালে অস্ট্রেলিয়া সফরে আই এফ এ দলের

কাবুলের একটি সমাবেশের একাংশ

কাবুল শহরের আধুনিক এলাকা

খেলোয়াড় ছিলেন। দ্বিতীয় অনিল নন্দী ছিলেন উনিশশো আটচল্লিশে লন্ডন অলিম্পিকে ভারত দলের খেলোয়াড়। তৃতীয় নিখিল খেলেছেন মেলবোর্ন অলিম্পিকে। এবং তিনজনই হাফ ব্যাকে। কনিষ্ঠ সুনীল নন্দী ইনি। সুনীল মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গলে খেলে বেশ নাম করেছিল। খেলার মাঠে এদের এত সুনাম। সামাজিক পরিবেশে মাটির মানুষ।

হ্যাঁ, একটা কথা মনে পড়ে গেল। ভেটারেন্স ক্লাবের পুরস্কার বিতরণী সভায় যাবার আগের দিন আমার খেয়াল হল, বেস্ট প্লেয়ারের ট্রফি দেবার পর আমাকে হয়তো দু চারটি কথা বলতে বলা হবে। ভেবে পাচ্ছিলুম না কী বলব। তখন পুরস্কার-বিতরণী সভায় ক্যালকাটা, ডালহৌসী, রেঞ্জার্স ক্লাবের অনেক সাহেব উপস্থিত থাকতেন। রাত্রিতে আমি ভেবেচিন্তে ওই অনুষ্ঠানে বলার মতো একটা লেখা তৈরি করলুম ইংরেজিতে। তারপর বারবার পড়ে সেটা একেবারে মুখস্থ করে রাখলুম। পরের দিন সত্যিই আমাকে কিছু বলতে বলা হল। আমি একেবারে প্রোফেশনাল বক্তার মতো গড় গড় করে মুখস্থ বক্তৃতাটা উগরে দিলুম। খুব বাহবা পেয়েছিলুম। ভাগ্যিস আগে থেকে আন্দাজ করতে পেরেছিলুম। টিপসটা তোমাদের দিয়ে রাখলুম। যদি তেমন কোনো সুযোগ আসে, আগে থেকে প্রস্তুত হয়ে থেকো। তাহলে অসুবিধায় পড়বে না।

টোকিও এশিয়ান গেমস তো ছিলই, ওই বছর আমার বিদেশ সফরের আর-একটি সুযোগ এসে গেল। আফগানিস্থানের স্বাধীনতা উৎসবের নাম 'জাসন উৎসব'। আফগান সরকারের আমন্ত্রণে ভারত থেকে আগেও 'জাসনে' যোগ দিয়েছে সাংস্কৃতিক দল। ওই বছর সাংস্কৃতিক দলের সঙ্গে কাবুলে গেল ভারতীয় হকি দল এবং সম্মিলিত বিশ্ববিদ্যালয় ফুটবল দল। সাংস্কৃতিক দলে ছিলেন বিখ্যাত গায়ক বড়ে গোলাম আলী, তালাত মামুদ, তবলা-বাদক চতুরলাল, আর একজন নর্তকী মহিলা, তাঁর নাম এখন মনে পড়ছে না। ফুটবল দলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে নির্বাচিত হয়েছিলুম আমি, অবনী বসু, অরুণ ঘোষ, বেণু ঘোষ ও অর্ধেন্দু দাশগুপ্ত। বাকি সব অন্যান্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কারা নির্বাচিত হয়েছে, কে অধিনায়ক, কে ম্যানেজার, কিছুই আগে জানতুম না। আমাদের সরাসরি দিল্লি চলে যেতে বলা হল। দিল্লি থেকে নাকি লাক্সারি বাসে করে কাবুল যেতে হবে।

দিল্লিতে পৌঁছবার পর আমাদের ন্যাশনাল স্টেডিয়ামে তোলা হল। কিন্তু পরেই এক ঝামেলায় পড়লুম। কেউকেটো গোছের দুই শিখ যুবক সেখানে আমাদের থাকতে দেবে না। স্টেডিয়ামের কর্মীরাও দেখলুম ওই দুই যুবকের কথার উপর কথা বলতে সাহস পাচ্ছেন না। শুনলুম ও'রা কেন্দ্রীয় মন্ত্রী সর্দার বলদেব সিংয়ের পুত্র। আমাদের অনেকেই ঘাবড়ে গেল। আমি কিন্তু সোজা থানায় গিয়ে ওদের বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করলুম এবং পুলিসের সাহায্যে ওই স্টেডিয়ামেই আমাদের অবস্থান কায়েম করে নিলুম। ওই ঘটনার আগেই অবশ্য সবাই একমত হয়ে আমাকে দলের অধিনায়ক ও ম্যানেজার নির্বাচিত করেছিল। কর্তব্যবোধের তাগিদেই আমাকে থানায় যেতে হয়েছিল।

লাক্সারি বাসের রুট ছিল দিল্লি-লাহোর-পেশোয়ার হয়ে ঐতিহাসিক খাইবার পাসের মধ্য দিয়ে কাবুল পর্যন্ত। বাস চলছে হু হু করে। দু পাশের মনোরম দৃশ্য আমরা দু চোখ দিয়ে গিলছি। অমৃতসর পেরিয়ে পাকিস্তান সীমানায় ঢুকতেই পাকিস্তানের মিলিটারি পুলিস বাসখানিকে ঘিরে ধরল। আমরা বেশ একটু ঘাবড়ে গেলুম। কিন্তু মিলিটারি পুলিস কোনোরকম সার্চ বা কোনো অসদ্ব্যবহার করল না। বরং বাসখানিকে আগলে রেখে যেভাবে ভি আই পি-র গাড়ির সঙ্গে চলে সেইভাবে আগু-পিছু চলতে লাগল মিলিটারি। একেবারে খাইবার পাস পর্যন্ত। শুনলুম নিরাপত্তার জন্য ভারত ও পাকিস্তান সরকারের মধ্যে ওই ধরনের ব্যবস্থা আগে থেকেই ঠিক ছিল।

একটা ঘটনার কথা মনে পড়ছে। কয়েকশো মাইল দীর্ঘ পথ। মাঝে-মাঝে বিশ্রাম নিতে হয়েছে চা বা জলখাবারের জন্য। কিংবা অন্য কোন কারণে। কী জানি কেন তবলাবাদক চতুরলাল আমার প্রতি একটু বেশি স্নেহপরায়ণ হয়ে উঠেছিলেন। মাঝে-মাঝেই সুবিধা অসুবিধার কথা জিজ্ঞাসা করছিলেন। আর সব সময়ই দেখেছি—বাঁয়া-তবলাকে কোনো সময় কোলছাড়া করেননি। কখনো তিনি হয়তো বাস থেকে নেমেছেন, আমি বাসের মধ্যে বসে আছি। বাঁয়া তবলা আমার কোলের উপর রেখে বলেছেন, "চুনী,ইয়ে হামারা প্রাণ হ্যায়,সামহালকে রাখনা।"

কাবুলে আমরা উষ্ণ অভ্যর্থনা পেয়েছিলুম। দু চোখ ভরে উপভোগ করেছিলুম 'জাসনের' বর্ণাঢ্য শোভা। শুধু শেষ ম্যাচটি ছাড়া সব ম্যাচেই আমরা জিতেছিলুম। শেষ ম্যাচটি ১—১ গোলে ড্র হয়েছিল এক মজার মধ্যে। খেলা হবার কথা ছিল ৩০ মিনিট করে ৬০ মিনিট। প্রথমার্ধে আমরা ১—০ গোলে এগিয়েছিলুম। দ্বিতীয়ার্ধের ৩০ মিনিট পার হবার পরও খেলা শেষ হল না। তখন রেফারীর হাত থেকে বাঁশি নিয়ে খেলা পরিচালনা করতে আরম্ভ করলেন ফুটবলের এক কর্মকর্তা। নাম সিরাজি। বুঝলুম কাবুল বিশ্ববিদ্যালয় দল গোল শোধ না করা পর্যন্ত সিরাজি খেলার শেষ বাঁশি বাজাবেন না। সত্যিই গোলটি শোধ হবার পর খেলা শেষ হল। সিরাজিকে আমি দোষ দিচ্ছি না। প্রদর্শনী খেলা। দর্শকদের আনন্দের জন্যই তিনি দশ-বারো মিনিট বেশি খেলিয়েছিলেন এবং আনন্দ দিতে পেরে একটু গর্বও বোধ করেছিলেন।

মানুষের বিপন্ন অস্তিত্বকে বাঁচাবার জন্য সংরক্ষণ ও প্রকৃতিকে জানা একান্ত প্রয়োজন।

জানতে হ'লে পড়ুন

ডঃ তারকমোহন দাসের

জোনাকি পাবলিকেশনস্

১২, বঙ্কিম চাটার্জী স্ট্রিট, কলিকাতা-৭৩

সন্ধ্যার বিদায়-ভোজে আমাদের রাষ্ট্রদূত শ্রীহাকসার বিভিন্ন দলের ম্যানেজারকে টপ টেবিলে ডাকলেন এবং দলের পক্ষ থেকে কিছু বলার জন্য অনুরোধ করলেন। আমি উঠে দাঁড়াতেই হাকসার একটু আশ্চর্য হয়ে গেলেন। ইংরেজিতে বললেন, "তুমিই ক্যাপ্টেন, তুমিই ম্যানেজার?" সিরাজি ফোড়ন কাটলেন, "বেস্ট প্লেয়ার টুউ।"

আফগান সরকারের আতিথেয়তার প্রশংসা করে এবং 'জাসনে' আমাদের আমন্ত্রণ জানানোর জন্য ধনবাদ জানিয়ে আমি যেই বললুম, ভারত-আফগান মৈত্রী বন্ধন বেঁধে রেখেছেন আমাদের কবি রবীন্দ্রনাথ 'কাবুলিওয়ালা' গল্পে 'মিনি' ও 'রহমত'-এর চরিত্রের মধ্যে, অমনি হলে উঠল কানফাটা করতালি ধ্বনি। হাকসার আমাকে জড়িয়ে ধরলেন।

কত কথাই মনে পড়ছে। আটান্নয় জাতীয় ফুটবলের আসর বসেছিল হায়দরাবাদে। ওটা কিন্তু সাতান্নর সন্তোষ ট্রফির খেলা। আমাদের বাংলা দল হেরে গিয়েছিল সেমিফাইনালে মহারাষ্ট্রের কাছে। ফেরার সময় পি-কে ভয়ঙ্কর ধরনের জল-বসন্ত রোগে আক্রান্ত হলেন। পি-কেকে বেজওয়াড়া বা ওয়াল্টেয়ার হাসপাতালে ভরতি করার কথা উঠেছিল। কারণ জলবসন্ত রোগ নিয়ে রেল ভ্রমণ নিষিদ্ধ। কিন্তু ওই অসুখ তো দু' চার দিনে সারার নয়। পি-কের সঙ্গে সেখানে থাকবেই বা কে? তাই আমাদের ম্যানেজার সরোজ বসু এক বুদ্ধি ঠাওরালেন। ছোট একটা কুপেতে পি-কেকে তুলে ফুল দিয়ে কামরাটি সাজিয়ে কিছু ধূপকাঠি জ্বালিয়ে দিলেন। একটি কাগজে লিখে দিলেন, "নবপরিণীত বরবধূ ভ্রমণ করছে, দয়া করে বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাবেন না।" পাছে অন্য যাত্রী কামরায় উঠে বসন্তরোগগ্রস্তকে দেখে গোলমাল করে, সেই ভয়েই ওই ব্যবস্থা। সরোজদাই পি-কের শুশ্রূষার ভার নিলেন। শুধু ট্রেনেই নয়, পরেও পি-কেকে যত্ন করে তিনি খাড়া করে তোলেন।

চমৎকার লোক ছিলেন সরোজদা। শুনেছি বরিশালের এক জমিদার-পরিবারের সন্তান। উচ্চশিক্ষিত। বড় চাকরি করতেন। সব ছেড়ে-ছুড়ে দিয়ে ফুটবলের নেশায় মেতে উঠে প্রশাসনের মধ্যে জড়িয়ে পড়েছিলেন। ক্ষমতাসীন গোষ্ঠীকে সমর্থন করলেও সত্য অস্বীকার করতেন না। একবার আই এফ এ গভর্নিং বডির সভায় একটি অন্যায় প্রস্তাব সমর্থন করায় সরোজদাকে বলেছিলুম, "আপনিও ওই অন্যায় প্রস্তাবের পক্ষে ভোট দিলেন?" সরোজদা রসিকতা করে বললেন, "কী করব বল ভাই? আমরা যে গৌরাঙ্গ হয়ে গেছি। বেচুদার পক্ষে হাত তুলতে-তুলতে হাত তুলেই থাকি। হাত আর নামে না।"

সেবার এশিয়ান গেমসে দল গড়ার জন্য কোচিং ক্যাম্প খোলা হয়েছিল কটকের বারবাটি স্টেডিয়ামে। ক্যাম্পে যোগ দেবার দিন কুড়ি আগে আমি আক্রান্ত হলুম জলবসন্ত রোগে।

(ক্রমশ)

শীত-শীতুলি

বিমল ঘোষ (মৌমাছি)

পোষ পোষালী নতুন ধান,
নতুন ধানের মিষ্টি ঘ্রাণ।
মৌশুমী ফুল বেড়ার ধারে
বাগান সাজে রং-বাহারে।
লাল ডালিয়া, হলুদ গাঁদা
পাহারা দেয় খোদন দাদা।
খোদন দাদার মেজাজ কড়া,
ফুল দেয় না, লাগায় তাড়া।

পোষ-পোষালী বাড়ছে শীত
শ্যাল-শেয়ালীর খেয়াল গীত।
ঘুম নেইকো রাতে ভ্যাবার
ভাবছে কবে মাসটা কাবার
চাল নারকেল শিলে বেটে
গড়ছে দিদুন চাপড়া পিঠে
ডুবিয়ে পিঠে নলেন রসে
ফোকলা ভ্যাবা চুষবে বসে।

পোষ পোষালী চাষা রাজা
পিঠে খেল বাসি তাজা।
পিঠের লোভে হাজির বাঘ
বাঘ নয় গো মাসটা মাঘ।
হাড়-কাঁপানী মাঘের বায়
মাঘের শীত বাঘের গায়।
বাঘের কামড় মাঘের দাঁতে
চানের জল আর বিছানাটাতে।

ছবি অনুপ রায়

সঙ্গী

আলোক সরকার

অরিন্দম বলল, "চলো, একটু চা-খানায় বসা যাক।"

অরিন্দমের সঙ্গে অনেকদিন পরে দেখা। বলতে গেলে ইস্কুল ছাড়ার পর আর ওর সঙ্গে দেখাই হয়নি। কখনো দেখা হয়েছে ট্রামে-বাসে, রাস্তার মোড়ে, দু-এক মিনিট কথাবার্তা, কেমন আছ, ভাল আছি ইত্যাদির পর দুজনে দুদিকে চলে গিয়েছি। অথচ ইস্কুলে অরিন্দম ছিল আমার সব চাইতে কাছের বন্ধু। ছুটির দিনেও ওর সঙ্গে একবার দেখা না হলে মন খারাপ হয়ে যেত। ইস্কুল ছাড়ার পর সব কেমন এলোমেলো হয়ে গেল।

হাতে সময় ছিল। আর তাছাড়া এই দশ মিনিট একসঙ্গে হাঁটার ফাঁকেই অরিন্দম জানিয়ে দিয়েছিল ও নাকি আজকাল হাতের রেখা দেখে মানুষের ভূত-ভবিষ্যৎ-বর্তমান সব কিছুই নিখুঁতভাবে বলে দিতে পারে। এই সেদিন এক ভদ্রলোকের হাত দেখে বলল, তিনি যেন জলের থেকে একটু দূরে-দূরে থাকেন, সামনের সাত দিন তাঁর একটা মস্ত জল-ফাঁড়া আছে। ভদ্রলোক জানালেন, তাঁকে নৌকো করে যাওয়া-আসা করতে হয় না, আর কলকাতায় যখন থাকেন, তখন পুকুরে-টুকুরে ডুবে মরারও ভয় নেই। অরিন্দম কিছু বলেনি। কিন্তু সাতদিনের মধ্যেই কলকাতায় তুমুল বৃষ্টি নামল। অলিগলি থেকে বড়-বড় চওড়া ট্রাম-বাসের রাস্তা পর্যন্ত এক হাঁটু জলে ভর্তি। ভদ্রলোক আপিস থেকে বাড়ি ফিরছেন, জলের মধ্যেই প্যাণ্ট গুটিয়ে নিয়ে হাঁটছেন, তাছাড়া আর কোনো উপায় ছিল না, রাস্তার এক জায়গায় পথের উঁচু-নিচু ঠিক করতে না পেরে পড়ে গেলেন জলের মধ্যে। উঠেও পড়লেন বটে তাড়াতাড়ি, কিন্তু তার থেকেই মস্ত অসুখ, সাত দিনের মধ্যেই সব শেষ।

হাতের রেখা-টেখা দেখে সত্যি কিছু বলা যায় কিনা তা না জানলেও, আর সবার মতো, হাত দেখানোর সুযোগ মিললে আমারও হাত বাড়িয়ে দেবার ইচ্ছে করে। অরিন্দমের সঙ্গে চায়ের দোকানে যে ঢুকলুম, তার পিছনে হাতে সময় থাকা ছাড়াও হাত-দেখানোর লোভটাও মস্ত কাজ করল। তখনও ঠিক বিকেল হয়নি, চায়ের দোকান সবে খুলেছে, রেস্টুরেণ্টের বেয়ারা সবগুলো টেবিল-চেয়ার তখনও গুছিয়ে উঠতে পারেনি। লোক-জন একেবারে নেই। অরিন্দম এক কোণের একটা চেয়ারে বসে আমাকে তার পাশের চেয়ারে বসার ইঙ্গিত করল।

অরিন্দম কেন আমাকে তার পাশের চেয়ারে বসতে বলল, তা আমি বুঝতে পারলুম। আমি ওকে আমার হাত দেখার কথা বলেছিলুম, ও এখন আমার হাত দেখতে চায়। পাশাপাশি বসলেই হাত দেখার বেশি সুবিধে। কিন্তু আমি একটু ইতস্তত করে ওর সামনের চেয়ারে বসলুম।

অরিন্দম একটু অবাক হল। যতটা অবাক হল, তার চাইতে বেশি আহত। মুখে কিছু বলল না। ও মুখে কিছু না বললেও আমি মনে-মনে নিজের ব্যবহারের জন্য লজ্জিত হলুম।

এইরকম যে কতবার ঘটেছে। কতবার এইরকম অভদ্রতা করেছি, কত বন্ধুকে আহত করেছি।

চা এল। অরিন্দম আর তেমন করে কথা বলছে না। ও

এতক্ষণ অনর্গল কথা বলছিল, এখন আমার প্রশ্নের দু-একটা ছোটখাটো উত্তর দিচ্ছে শুধু। আমার হাত দেখায় ওর আর কোনো উৎসাহ নেই।

শেষটায় আমিই বললুম, "তুমি খুব অবাক হয়ে গেছ, না অরিন্দম?"

অরিন্দম কথা ঢাকবার জন্য বলল, "কেন?"

"রেস্টুরেন্টে আমার সামনের চেয়ার খালি রেখে আমি কখনো বসি না। তোমার পাশাপাশি বসলে আমার সামনের চেয়ার খালি থাকত।"

অরিন্দম অবাক হয়ে বলল, "কিছু বুঝতে পারছি না।"

"না পারার-ই কথা!" একটু থেমে আমি আবার বললুম, "মাঝে-মাঝে ইচ্ছে করে একবার পরীক্ষা ক'রে দেখতে। আমার সেই সঙ্গী, নির্জন দিনের সঙ্গী সে আজও আছে কিনা, আমার সঙ্গে কথা বলার আগ্রহ এখনো তার আছে কিনা।"

অরিন্দম একটু বিরক্ত হয়ে বলল, "তুমি যদি কিছু বলতে চাও স্পষ্ট করে বলো, বিকাশ। হেঁয়ালি ভাল লাগে না।"

"তুমি শুনবে?"

"কেন শুনব না?"

"কোনোদিন কাউকে বলিনি। ভেবেছি, বলাটা হয়তো সে পছন্দ করবে না। কিন্তু আজ এত বছর পরে হয়তো আমার কথা তার আর মনে নেই, এখন বোধহয় বলা যেতে পারে।"

অরিন্দম আরো দু কাপ চায়ের কথা বলল। আমি আমার কথা বলতে শুরু করলুম।

স্কুল ছাড়ার পর স্কুলের পুরনো বন্ধুরা কোথায় কোনদিকে চলে গেল। কেউ ভর্তি হল বড় কলেজে, কেউ পড়তে গেল বিজ্ঞান, কেউ বাণিজ্য, আমি আমার বাড়ির কাছাকাছি আশুতোষ কলেজে ঢুকলুম। ক্লাসে আমার পরিচিত কেউ নেই, স্কুলের বন্ধুরা কেউ নেই, আমার খুব একা-একা লাগত। সব চাইতে কষ্ট হত বিকেলবেলায়। কলেজ থেকে ফিরে এসে করবার কিছু নেই, অথচ বিকেলবেলায় বাড়িতে বসে থাকাও যায় না। পুরনো বন্ধুরা কেউ নেই, নতুন বন্ধু পেতেও সময় লাগে, আমি একা-একা রাস্তায়-রাস্তায় ঘুরে বেড়াতুম। কিন্তু কতক্ষণ আর রাস্তায় এলোমেলো ঘুরে বেড়ানো যায়, পার্কে দাঁড়িয়ে ক্রিকেট খেলা দেখা যায়! সেই বিকেলগুলো আমার কাছে দুর্বিষহ হয়ে উঠেছিল। সেই বয়সে, তুমি বুঝতেই পারো, নানা বিষয়ে কৌতূহল জেগে ওঠে, নানা বিষয়ে জানতে ইচ্ছে হয়। তখন রোজই নতুন-নতুন জানা আর নিজের উপর গভীর আস্থায় নিজেকে মস্ত পণ্ডিত বলে ভাবা। তখন সঙ্গীর দরকার একান্ত, যার কাছে বিদ্যে জাহির করা যায়, যাকে তর্কে পরাস্ত করে একটা উঁচুদরের আত্মপ্রসাদ লাভ করা যায়, যার সঙ্গে ভাবনা বিনিময় করে নিজেকে তৈরি করে নেওয়া যায় ভিতরে-ভিতরে। আমার অনুরাগের বিষয়টা ছিল সাহিত্য, কিন্তু কার সঙ্গে কথা বলব, কাকে বুঝিয়ে দেব কবিতা কাকে বলে আর কাকে বলে না। কলেজের বন্ধুদের সঙ্গে আলাপ জমে ওঠেনি, সারাদিন চুপচাপ কাটে, আর বিকেলবেলায় বড় বেশি তীব্র হয়ে ওঠে আমার নিঃসঙ্গতা।

শেষটায় চায়ের দোকানের আশ্রয় নিলুম। চায়ের দোকানে বেশ সময় কাটে, এক কাপ চা নিয়েই আধঘণ্টা একঘণ্টা বসা যায়, শোনা যায় আশেপাশের টেবিলের আলাপ-আলোচনা, গাল-গল্প। বিকেল কাটানোর পক্ষে মন্দ নয় চায়ের দোকান। কিন্তু অনেক দোকানে বেশি ভিড়, সেখানে মিনিট পনেরোর বেশি বসাই যায় না, আমি খুঁজে পেতে হাজরা রোডে একটা কম-ভিড়ের চায়ের দোকান বের করলুম। বিকেলবেলায় আমি চলে যেতুম সেই চায়ের দোকানে, ঘন্টাখানেক বসতুম। তারপর এলোমেলো খানিকটা ঘুরে বাড়ি ফিরে আসতুম। চায়ের দোকানে জানলার পাশের চেয়ারটা আমার বাঁধা ছিল, জানলা দিয়ে দেখতুম পথের মানুষ-জন, গাড়ি-সাইকেল, আর শুনতুম আমার টেবিলের আশেপাশের টেবিলের নানা বয়সের নানা ধরনের লোকদের পৃথিবীর প্রায় সব বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা তর্ক-বিতর্ক। সেইসব আলোচনা আমার তেমন ভাল লাগত না, তবু সময় কাটানোর জন্য সেদিকে মন দিতুম। ওরা কেউ সাহিত্য বোঝে না, সাহিত্যের কোনো খোঁজখবর রাখে না। ওদের সঙ্গে কখনও দু-একটা কথা বলে আমি এক কোণের জানালার ধারের চেয়ারে বসে হয় রাস্তা দেখতুম, না হলে সদ্য-কেনা কোনো ম্যাগাজিনের ভিতরে ডুবে যেতুম। চায়ের দোকানে যারা আমার পরিচিত, তারা কখনো আমার হাতের ম্যাগাজিনের খোলা পাতা উঁকি দিয়ে দেখত, কখনো বা হাতে নিয়ে কবিতা-বিষয়ে দু-একটা ব্যঙ্গ-মেশানো সরল মন্তব্য করে আবার ফিরিয়ে দিত। আমি তাতে রাগ করতুম না, ওদের কথার উত্তর না দিয়ে কেবল মৃদু হাসতুম, সবার সঙ্গে কি সাহিত্য-আলোচনা করা যায়! রাগ না-করলেও মনে-মনে কিন্তু আমি একটা কষ্ট পেতুম, আমার মনের কথাগুলোকে বলতে না-পারার কষ্ট। যদি সঙ্গী থাকত আমার একজন, কথা বলা যায় এমন সঙ্গী!

সেই চায়ের দোকানে এক কাপ চায়ের দাম ছিল এক আনা। তখন নয়াপয়সা অর্থাৎ আজকের দিনের হিসেবের পয়সা চালু হয়নি। প্রথম-প্রথম আমি রোজকার দাম রোজই মিটিয়ে দিতুম, পরে দোকানের মালিকের সঙ্গে চেনাশোনা হতে ঠিক হল সারা-মাসের চায়ের দাম আমি মাসের শেষে একবারে মিটিয়ে দেব। এটা আমার পক্ষে সুবিধের ছিল, মালিকেরও কোনো আপত্তি ছিল না। ষোলো আনায় এক টাকা—প্রতিমাসের শেষে আমাকে দুটাকা দিতে হত। সারা-মাসে বাড়তি চা আমি কাপ-দুয়েকের বেশি খেতুম না।

এইরকমই চলছিল। আমার বিকেলগুলো একরকমভাবে কেটে যাচ্ছিল। খুব ভালও না, খুব মন্দও না। কিন্তু সেবার মাসের শেষে দাম মেটাতে গিয়ে একটা ঘটনা ঘটল। আমি, যেমন দেওয়ার কথা, দোকানের মালিককে দুটাকা দিতে গেলুম আর তিনি অল্প হেসে বললেন, "চার টাকা।"

আমি অবাক হলুম। বললুম, "দুটাকাই তো হবার কথা। এমাসে এক কাপের বেশি চা আমি মাত্র দুদিন খেয়েছি।"

মালিক বললেন, "ঠিকই। কিন্তু আপনার বন্ধু? তিনিও তো রোজই আপনার সঙ্গে চা খেয়েছেন।"

বন্ধু! বন্ধু আবার আমার কে! আমি প্রতিবাদ করতে গেলুম, কিন্তু দেখি, দোকানের আর-সবাই হাসছে। তারা সবাই আমার পরিচিত, একই দোকানে বসে অনেকদিন চা খাচ্ছি, কেউ আমার শত্রু নয়। তাদের একজন তো বলেই উঠল, "আপনার সামনের চেয়ারে বসে চা খান, আজও খেয়েছেন, এই তো এই-মাত্র তিনি উঠে গেলেন।"

আমার সঙ্গে মজা করার অথবা আমাকে জব্দ করার কোনো কারণই এদের থাকতে পারে না। আমি বুঝলুম, কোথাও একটা ভুল-বোঝাবুঝি হচ্ছে। আমি আর কথা বাড়ালুম না, মালিকের হাতে পুরো চার টাকা দিয়ে তাড়াতাড়ি দোকান থেকে বেরিয়ে পড়লুম।

বাড়ি ফিরতে-ফিরতে আমার মনে হল হয়তো কোনো অসৎ লোক আমার বন্ধু সেজে আমার নামে চা খেয়ে যায়। আমি ঠিক করলুম, এবার থেকে খুব কড়া নজর রাখতে হবে। কে আমার সামনের চেয়ারে বসে আমার বন্ধু সেজে আমার নামে চা খেয়ে যায়, লক্ষ করতে হবে।

সারা মাস খুবই সতর্ক থাকলুম। আমার সামনের চেয়ারে কেউ বসলই না। আমার পাশের চেয়ারে যারা বসল, তারা দাম

মিটিয়ে দিয়েই চলে গেল। আমি ভাবলুম, লোকটা হয়তো সব জানাজানি হয়ে গেছে বুঝে ভয়ে আর আসছেই না। একরকম ভালই হল, আমার দুটো টাকা লোকসান হল বটে, কিন্তু আর হবে না।

কিন্তু সে-মাসেরও শেষে সেই একই ঘটনা। মালিক আমার কাছ থেকে চার টাকা চাইলেন। আমি জোর দিয়ে বললুম, "কেউ আমার সংগে চা খায়নি, আমার সামনের চেয়ার সারা মাস আগাগোড়া খালিই ছিল।"

দোকানের মধ্যে অনেকেই আমার পরিচিত। তাদের একজন কিন্তু বলে উঠল, "সে কী, আপনার সামনের চেয়ারে বসে তিনি রোজ চা খান, আপনার সংগে কত গল্প করেন, হাসি-ঠাট্টা-মশকরা করেন, এই তো আজই এতক্ষণ গল্প করে এইমাত্র চলে গেলেন।"

আর-একজন বলল, "আপনার সংগে সাহিত্য-আলোচনা করেন, আপনিও তাঁর সঙ্গে তর্কে মেতে ওঠেন।"

এরা সবাই আমার বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র করতে নেমেছে। তাহা মিথ্যে বলছে। রাগে আমার শরীর কাঁপতে লাগল। কিন্তু এতগুলো লোকের অভদ্রতার বিরুদ্ধে আমি কিছুই করতে পারব না, পারার ইচ্ছেও আমার নেই। আমি আরও দু টাকা মালিকের হাতে দিয়ে কোনোদিকে না তাকিয়ে দোকান থেকে বেরিয়ে এলুম।

আর এ দোকানে নয়। কালই অন্য দোকানের খোঁজ করতে হবে।

পরের দিন ঘুরতে-ঘুরতে আর-একটা চায়ের দোকানের সামনে এলুম। এ-দোকানে চায়ের দাম একটু বেশি, ছ' পয়সা, অর্থাৎ তখনকার দিনের দেড় আনা। দোকানটাও আগের চাইতে অনেক বড়, সাজানো-গোছানো। আমি দোকানে ঢুকে জানলার পাশেরই একটা চেয়ার পেয়ে গেলুম। এ-দোকানে ভিড়ও অনেক বেশি। চা আনতে বলার পরেই আমি বুঝতে পারলুম, এখানে বেশিক্ষণ বসা যাবে না, একঘণ্টা আধঘণ্টা তো নয়ই, পনেরো মিনিটও নয়। এ দোকানে আমার চলবে না। আমার সময় কাটানো নিয়ে কথা, সময় কাটানোর মতো, অনেকক্ষণ বসার মতো একটা দোকান খুঁজে বার করতে হবে।

ভিড় ক্রমশই বাড়ছে। অনেক লোক দাঁড়িয়ে-দাঁড়িয়েই চা খাচ্ছে। আমি দেখলুম, আর বসা সম্ভব নয়। আমার চা-ও ফুরিয়ে গেছে। মাত্র দশ মিনিট বসেছি, এর মধ্যেই উঠতে হবে!

আমি উঠে দাঁড়ালুম। আস্তে আস্তে কাউণ্টারে গিয়ে টেবিলের উপর ছ-পয়সা রাখলুম। যে আমাকে চা দিয়েছিল, কাউণ্টারের লোকটি তার দিকে তাকাল। সে বলল, "তিন আনা।"

তিন আনা! আমি কাঁপা গলায় বললুম, "কিন্তু আমি, আমি তো এক কাপই চা নিয়েছি!"

"আপনার বন্ধু, যিনি আপনার সংগেই চা খেলেন, গল্প করলেন, তারপর দাম না দিয়েই চলে গেলেন, তার চায়ের দাম?"

আমার সমস্ত শরীর তখন কাঁপছে। আমি কোনমতে তিন আনা বার করে টেবিলের উপর রাখলুম।

রেস্টুরেন্ট থেকে বেরোতে যাব, হঠাৎ আমার মনে পড়ল, এত ভিড়ের মধ্যেও আমার সামনের চেয়ারটা কিন্তু খালিই ছিল।

আমার গল্প শেষ হল। অরিন্দম কিছু বলল না, চুপ করে বসে রইল। আমার হাত দেখার কথা ওর মনেই পড়ল না, আমারও না।

ছবি সুধীর মৈত্র

কলকাতার পেল্হাদ

মণ্টুকে ছোটবেলা থেকে মানুষ করেছে যে "দিদি" সে থাকে গোবিন্দপুর বস্তীতে। এবারের জলে দিদিদের বস্তী থেকে সরিয়ে এনে রাখা হয়েছিল স্কুল দালানে। সেখানে পাঁচদিন তাদের চিড়ে, মুড়ি আর খিচুড়ি দেওয়া হয়েছিল খেতে।

মণ্টুর দিদির মন খারাপ। তাই মণ্টুরও মন ভাল নেই। কারণ দিদির ছেলে পেল্হাদ আর মণ্টু এক স্কুলেই পড়ে কিনা। তাই দুজনের খু-উ-ব ভাব। দিদি বলে "জোড়মানিক"।

পেল্হাদ স্কুলের ছুটি হ'লে লেকে গিয়ে চা বিক্রী করে। কিন্তু এবারের বৃষ্টিতে ওদের বস্তীতে দারুণ জল জমেছিল। আর পেল্হাদদের সব জিনিসপত্র সেই জলে নষ্ট হয়ে গেল।

তারপর থেকে পেল্হাদ আর স্কুলে আসে না। মন খারাপ করে ঘরেই শুয়ে থাকে রোজ রোজ।

পুজোয় পাওয়া সব পয়সা জমিয়ে মণ্টু পেল্হাদকে একটা কেট্‌লি, একটা পুঁচকে উনুন, চা-চিনি ছাঁকনী স-অ-ব কিনে দিয়েছে।

পেল্হাদ বিকেলে আবার চা বেচ্‌ছে, দুপুরে স্কুলে যাচ্ছে। আর টিফিনে? ওরা দুজনে মিলে খুব খেলা করে।

এই কলকাতা শহরে আমরা একে অপরকে সাহায্য করি। এটা কলকাতার বৈশিষ্ট্য।

ক্যালকাটা মেট্রোপলিটান ডেভেলপমেন্ট অথরিটি (সি. এম. ডি. এ) চায় তোমাদের কলকাতার এই বৈশিষ্ট্যটুকু বজায় থাকুক।

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

তোমাদের পাতা

চিঠি

প্রিয় আনন্দমেলা;

তোমাকে পেতে একদিন দেরি হলে আমার ভী—ষ—ণ মন খারাপ হয়ে যায়। আমি তোমার জন্য দিন গুনতে থাকি। আমাদের এখানে আসতে প্রায় তোমার দেরি হয়। কেন? পুরুলিয়া বড্ড দূর, তাই না? যেদিন তোমাকে কাগজওয়ালা সামনের ঘরের টেবিলে রেখে যায় সেদিন আমার খুব ভাল লাগে। কয়েকদিনের মধ্যেই তোমাকে পড়ে ফেলি। তুমি কি পাক্ষিক হতে পারো না? পাক্ষিক হলে খুব ভাল হয়।

সোমনাথ বসু

আমি মাসিক আনন্দমেলার একজন পাঠক। এই পত্রিকার টিনটিন ও টারজান পড়তে আমার খুব ভাল লাগে। পত্রিকাটি পনেরো দিন অন্তর বার হলে খুব ভাল হয়। মাসিক আনন্দমেলা পড়ার জন্যে প্রত্যেক মাসে আমি খুব আগ্রহের সঙ্গে অপেক্ষা করি। আমি বর্ধমানের বহুলায় থাকি, এখানে মাসিক আনন্দমেলা আসতে একটু দেরি হয়।

অভিজিৎকুমার দে (বয়স-৯)

মাসিক আনন্দমেলা আমাদের খুব ভাল লাগে। ভাল লাগে বলেই খুব তাড়াতাড়ি পড়া হয়ে যায়। তখন পরের সংখ্যার জন্যে অপেক্ষা করা ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। আপনাদের কাছে আমাদের অনুরোধ, আপনারা এই পত্রিকাটির দুটি করে সংখ্যা বার করুন প্রতি মাসে। যা চাই সব আছে মাসিক আনন্দমেলায়।

সুদীপরঞ্জন ঘোষ
অরুণ মজুমদার

ছবি এঁকেছে প্রতীক মুখোপাধ্যায় (বয়স ১১)

মিস্

ভাইদের মিস্,
করে ফিস্‌ফিস্—
খ্রীসমাস কেক থেকে
খায় কিস্‌মিস্।
ভাইদের মিস্,
কী পেটুক, ইশ—
যদিও বয়স তার
প্রায় চল্লিশ।

ঝুমনি চক্রবর্তী (বয়স-৮)

সবুজ পরী

সবুজ পরী সবুজ পরী
কোথায় তোমার দেশ?
সাত সমুদ্দুর তের নদী
তেপান্তরের শেষ।
রঙিন তোমার পাখনাগুলি
রামধনু রঙ আঁকা
চাঁদের মতো মুখখানি আর
চক্ষু দুটি বাঁকা।

তন্ময় দাশ (বয়স-১২)

বাঘমামা

বাঘমামা বাঘমামা
আর মানুষ খাবে?
মানুষ খেতে খেতে এবার
পেটটা ফেটে যাবে।

সপ্তর্ষি মিত্র (বয়স—৬)

ভেনিস

রাধানাথ চট্টোপাধ্যায়

কিছুদিন আগে প্রচণ্ড বৃষ্টিতে সারা কলকাতা শহর ডুবে গিয়েছিল। যে-সব রাস্তায় গাড়িঘোড়া চলে, সেইসব রাস্তার চেহারা হয়েছিল ঠিক খালের মতো। বাসট্রামের বদলে লোকে কয়েকদিন যাতায়াত করেছে নৌকোয়। শহরের পথে নৌকো দেখে অনেকেরই নিশ্চয় আর-একটি জলমগ্ন শহরের কথা মনে পড়ে গিয়েছিল। ইতালির উত্তর-পূর্ব প্রান্তের সেই ছোট্ট শহরটির নাম ভেনিস। আজ তোমাদের ভেনিসের কথা বলব।

ভেনিস জলে ও ডাঙায় মিলেমিশে একাকার হয়ে আছে। রাস্তায় পা দেওয়ার উপায় নেই একেবারে। এরোপ্লেনে এলে মার্কো পোলো এয়ারপোর্ট থেকে এসে এক বিরাট কার পার্ক—"পিয়াজেল রোমা" পর্যন্ত আসতে পারবে, তারপর মোটর বোটে পোঁটলা-পুঁটলি নিয়ে ভাসতে হবে খালে। যদি ট্রেনে আসো, স্টেশন থেকে সিঁড়ি দিয়ে নামলেই গ্র্যান্ড কানাল, অর্থাৎ শহরের প্রধান খাল, এটা ঘুরে-ঘুরে শহরের ভেতর দিয়ে গেছে।

ভেনিসে প্রায় দেড়শোর মতো খালপথ আছে, যার ধারে ধারে সার-সার উঁচু বাড়ি। প্রাসাদও আছে বেশ কিছু। আছে ব্যাঙ্ক, দোকানপাট, অফিস, রেস্টুরেন্ট আর আর্ট গ্যালারি। অধিকাংশ প্রাসাদই ঐতিহাসিক। সব লেখার মতো জায়গা নেই, তাই শুধু সুউচ্চ ক্যাসে দি মোর্সেনিজোর উল্লেখ করছি। এক-কালে এটি একটি অভিজাত বাসস্থান ছিল। গত শতাব্দীর ইংরেজ কবি বায়রন শেষ জীবনে এখানে ছিলেন।

অনেকগুলি খাল অত্যন্ত সরু, এঁকেবেঁকে চলেছে। এইসব খালপথে চলাফেরার একমাত্র সহায় গণ্ডোলা। গণ্ডোলা এক রকমের নৌকো। কাশ্মীরের শিকারার সঙ্গে এর খুব মিল আছে। গণ্ডোলা কালো কুচকুচে, বেশ শক্ত কাঠের তৈরি। হেলেদুলে চলে। মাঝি দাঁড়িয়েই থাকে, আর অপূর্ব কায়দায় গণ্ডোলা সামলায়। এই অপ্রশস্ত খালপথেও নিয়মকানুন মেনে চলতে হয়। মাঝেমধ্যে খাল এত সরু হয়ে আসে যে, গণ্ডোলার মাঝিকে অনেক কায়দা করে পুলের তলা দিয়ে যেতে হয়। এক-একটা খালে অনেকগুলো পুল। এই সব অপ্রশস্ত খালপথের দুধারের বাড়িই বহু পুরনো আমলের। কোনো বাড়িতে নোনা ধরেছে, চুনবালি খসে পড়েছে কোনো বাড়ির। তবে, অধিকাংশ বাড়ির বারান্দা লোহার রেলিংয়ে ঘেরা, ব্যালকনিতে ফুটে থাকে ফুল। রাত্তিরে চারধার নিঝুম হয়ে এলে মাঝেমধ্যে শুধু গণ্ডোলার দাঁড়ের শব্দ শোনা যায়।

অসংখ্য সেতু আছে ভেনিসে। এইরকম একটা সেতুর নাম ব্রিজ অব শাইজ, অর্থাৎ দীর্ঘনিশ্বাসের সেতু। ব্যাপারটা হচ্ছে, সেই কোন আদ্যিকালে সেতুর একদিকে ছিল বিচারালয়, অন্য-দিকে পিম্বি জেলখানা। এই ব্রিজের উপর দিয়ে কয়েদিদের নিয়ে যাওয়া হত জেলখানায়। তখন বাইরের পৃথিবী দেখে তাদের দীর্ঘনিশ্বাস পড়ত।

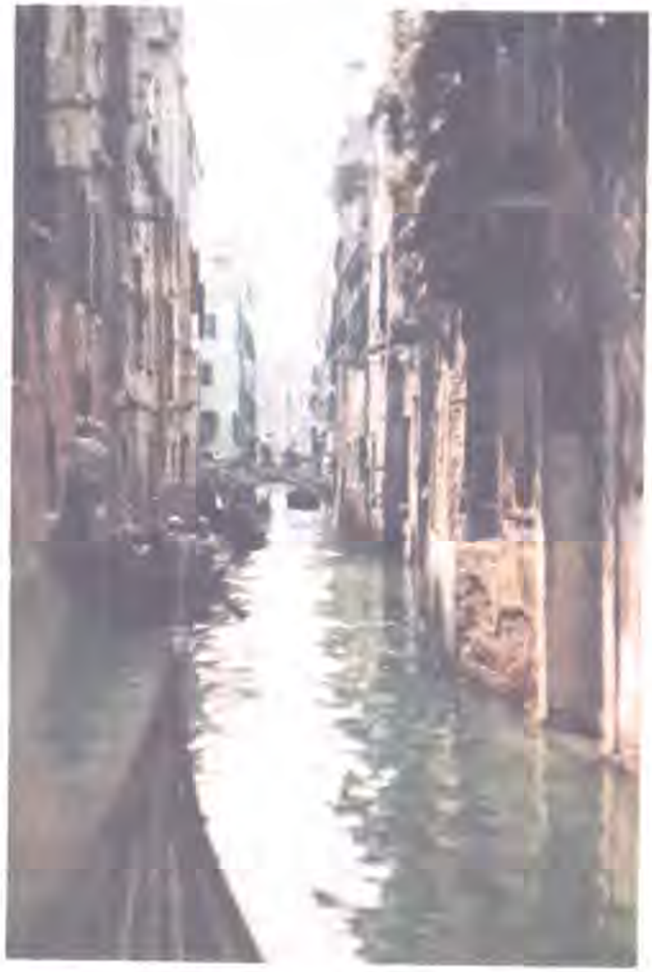

অপরাহ্নে প্রশস্ত প্রস্তর-প্রাঙ্গণ পিজা সান মার্কো অর্থাৎ সেন্ট মার্কস স্কোয়ারে বেশ জনসমাগম হয়। হাজার হাজার পায়রা আছে পার্কে, শিশুরা তাদের ভুট্টার দানা খাওয়ায়। প্রাঙ্গণের একদিকে দোজেস প্যালেস, অন্যদিকে ব্যাসিলিকা। সাধু মার্কের পবিত্র দেহ আছে এখানে।

ভেনিসে যে রাস্তা নেই, তা নয়। কিন্তু, সেগুলো অত্যন্ত সরু, কাশীর গলির কথা মনে করিয়ে দেয়। এক-একটা এত সরু যে, দু-তিনজন পাশাপাশি হাঁটতে পারে না। কিছু-কিছু বাড়ি খুব নিচু, বাড়ির মধ্যে এত অন্ধকার যে, দিনের বেলাতেও আলো জ্বালাতে হয়। সরু-সরু রাস্তার দুধারে ছোট-ছোট দোকানপাট। ভেনিসের বিখ্যাত কাঁচের জিনিসের দোকান।

সবই সুন্দর, কিন্তু সমুদ্র যদি কখনো অশান্ত হয়, তাহলে? কী হবে তাহলে?

অল্পদিনের মধ্যেই এই প্রশ্নের উত্তর পেয়ে গেছি। লন্ডনের 'টাইম্‌স'-এ দেখলাম, প্রবল জলোচ্ছ্বাসে সেন্ট মার্কস স্কোয়ার প্লাবিত হয়েছে। আর শুনলাম, ভেনিস শহর নাকি ধীরে ধীরে বসে যাচ্ছে! চমৎকার এই শহরটিকে বাঁচাবার জন্য আমেরিকার একদল লোক উঠেপড়ে লেগেছে। একটি কমিটীও তৈরি হয়েছে এই জন্যে।

যখন খুশি মুখে দিন মজার মিষ্টি নিউট্রিন

নিউট্রিন-এর

সুইট ও টফি

হ্যাঁ, এই তো সেই খাসা মিষ্টি, যা বছরের পর বছর ধরে
ভারতের অন্যান্য সব শহরে বাচ্চাদের মন কেড়ে নিয়েছে।
এবার সেই মিষ্টি এই শহরেও হাজির...
বাচ্চাদের মুখে সারাদিন 'চাকুম-চুকুম' চলতেই থাকবে।
আজই কিছু নিউট্রিন মুখে দিন, এরপর তফাৎটা শুধু বুঝুন!

nutrine

চাকুম-চুকুম খাসা
মিষ্টি দিয়ে ঠাসা

নিউট্রিন কনফেকশনারী কোম্পানি লিমিটেড
প্যালামানের রোড
চিত্তুর ৫৭১ ০০২, অন্ধ্র প্রদেশ

CAS/NC-20/78 BEN

স-এর দোষ

কুন্তক

ঘর থেকে হরেন বেরিয়ে যেতেই বৌদি হেসে বললেন ঃ যাই বলো বাপু, তোমার বন্ধুর একটু স-এর দোষ আছে।

শুনে আমিও একটু হাসলাম।

টুম্পি জিজ্ঞেস করল ঃ স-এর দোষ কাকে বলে মা?

ওই-যে আছে না একরকম, ভালমতো স-এর উচ্চারণ করতে পারে না? সামবাজারের সসিবাবুর গল্প শুনিসনি? সব স-ই ইংরেজি s-এর মতো হয়ে যায়।

ও, সেইরকম!

আমি বললাম ঃ সেইরকম। তবে আরো একরকম স-এর দোষ আছে। সেটা কি বৌদি জানো?

কী রকম?

অনেক সময়েই দেখবে, লেখায় বা বলায়, বাড়তি একটা স এসে হাজির হয়। দরকার নেই, তবু তিনি চলেছেন সঙ্গে-সঙ্গে।

মানে?

ধরো, তোমাকে কেউ জিজ্ঞেস করল, 'ধরণীবাবুর বাড়িটা কোথায় বলতে পারেন?' তুমি একটু ভেবে বললে, 'সঠিক জানি না।' পারো না বলতে?

পারব না কেন? সত্যি সত্যি ধরণীবাবুর বাড়িটা ঠিক কোথায়, জানিই না তো আমি।

বেশ তো, তাহলে বললেই পারো, 'ঠিক জানি না।'

তাই তো বলব।

আরে! দেখ্ টুম্পি, তোর মায়ের কাণ্ডটা দেখ্। এটা বললেও বলে হ্যাঁ, ওটা বললেও বলে হ্যাঁ!

এর মধ্যে এটা-ওটা আবার দেখলে কোথায়?

দেখলাম না? 'ঠিক' জানো, না 'সঠিক' জানো? বলো তো ঠিক করে।

ও, এই কথা। বললেই হল একটা।

সেই কথাই তো বলছি আমি। 'ঠিক জানো' বললেই যদি চলে, তাহলে 'সঠিক জানো' বলার দরকারটা কী?

এটা তো ভাবিনি কখনো। কেন বলি বলো তো?

বা রে, তুমি কেন বলো তা কাকু কেমন করে জানবে?

নন্তু একটু বাঁকা করে বলল ঃ কাকু জানবে না? দেখ্ না, কাকু এখনই একটা লম্বা লেকচার ঝাড়বে।

বৌদি ধমকে বললেন ঃ ও কী কথা হচ্ছে? বড্ড বেড়েছ।

আহা, বাড়াবাড়ির কী হল। ঠিকই বলেছে নন্তু। একটা লেকচারের জন্যই তো তৈরি হচ্ছি। আসলে কী হয় জানিস নন্তু, আমাদের একটা স্বভাবই হল বাড়িয়ে বলা। অল্পেতে খুশি হবে দামোদর শেঠ কি? আমরা সবাই দামোদর শেঠ। ভাল লাগলেই বলি ভীষণ ভাল, খারাপ লাগলেই দারুণ খারাপ। তাও আবার কতরকম সুর চড়িয়ে। তেমনি, 'ঠিক' বলে আমাদের তৃপ্তি নেই, জোর দিয়ে বলি, 'সঠিক'।

তা, বললেই বা। ক্ষতিটা কী? ভুল হয় ও-রকম বললে?

এখন আর ভুল বলা মুশকিল, অভিধানেও পাওয়া যাবে। সয়ে গেছে। তবে কারো-কারো হয়তো গায়ে লাগে।

কেন লাগে?

কেন? এই স-এর উৎপাতে কী-সব শব্দ তৈরি হয়, শোন্ একটু। কৃতজ্ঞ বললেই যেখানে চলে যায়, সেখানে বলে বসি সকৃতজ্ঞ। লজ্জিত বললে যেন যথেষ্ট লজ্জা হয় না, তাই কেউ বলে উঠলেন সলজ্জিত। সেইরকম সকাতর সোৎসুক সশঙ্কিত সচকিত।

বা রে, এরকম তো হামেশাই দেখি।

কাকু, রবীন্দ্রনাথের গানেই তো আছে, সতিমির রজনী সচকিত সজনী।

আছেই তো। সে-কথাই তো বলছি। বড়রাও এটা এত লিখে গেছেন যে।

থামিয়ে দিয়ে নন্তু বলে ঃ এতে ভুলটা কোথায়? স দিয়ে হবে না কেন, তাই বলো।

টুম্পির ওই লাইনটা দিয়েই বুঝবি কোথায় গোলমাল। সতিমির হয়। তিমির বিশেষ্য। তিমিরের সঙ্গে যুক্ত, তিমির আছে যেখানে, সতিমির। হল বিশেষণ। তেমনি বিশেষণ তৈরি করতে পারিস সনাথ সফল সজীব সদয়। দয়া আছে যার সে সদয়। লজ্জা আছে যার সে সলজ্জ। অথবা, লজ্জিত। এখানে এল ক্ত প্রত্যয়। হয় আগে বাড়ল, নইলে পরে বাড়ল। কিন্তু তাই বলে ল্যাজে-মুড়োয় দুদিকেই বাড়াবি? এই হচ্ছে দামোদর শেঠের স্বভাব। এ-ঘর থেকে চলে যেতে পারিস ভীত হয়ে বা প্রীত হয়ে। সভীত বা সপ্রীত হয়ে গেলে সেটা কি ভাল হয় বাপু? তেমনি, শঙ্কিত হওয়া চলে, সশঙ্ক হলেও চলে, সশঙ্কিত হবার কোনো দরকার দেখি না।

সশঙ্কিতই তো লেখে দেখি সকলে। সশঙ্ক আর কে লেখে?

কে লেখে? অনেকেই লেখেন। যে মধুসূদন একদিন পৃথিবী লিখতে প্রথিবী লিখেছিলেন, তাঁর এই সুন্দর লাইনটা জানিস না 'সশঙ্ক লঙ্কেশ শূর স্মরিলা শংকরে'?

জানতাম। মনে ছিল না সঠিক—sorry, ঠিক।

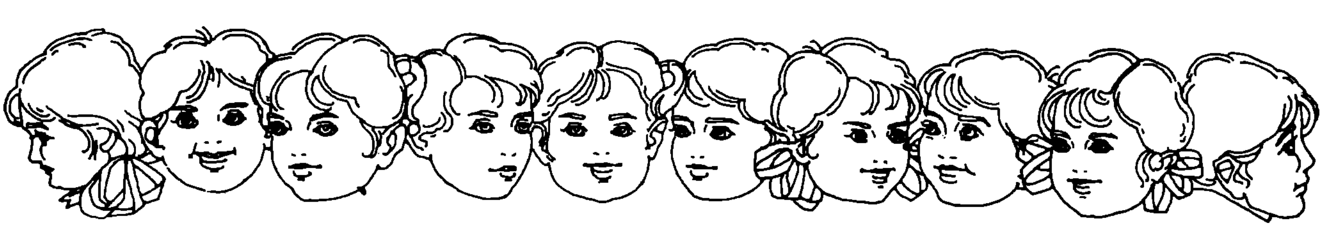

টারজান
এডগার রাইস বারোজ
হরিবরা আমাদের আক্রমণ করছে না, শুধু পাহারা দিতে-দিতে চলেছে। ব্যাপার কী?
মনে হয়, কিছু একটা মতলব এঁটেছে ওরা!
হরেক রকমের সর্পমানব দেখছি!
সে কী? আশ্চর্য তো!
সাধারণত ওরাপরস্পরকে দেখবামাত্র আক্রমণ করে। হঠাৎ ওরা এককাট্টা হল কেন?
সামনেও হরিব! দু' দিক থেকে ঘিরে ফেলেছে আমাদের!
ওরা এত রেগে গেল কেন?
সামনের পাহাড়টা আমরা টপকে যাই, তা বোধহয় ওরা চায় না!
কিন্তু এখানে থাকলে তো আমরা কচুকাটা হব!
তাহলে এগোনো যাক! এগোও সবাই!
হরিবদের বর্শাগুলো ধরে ফ্যালো। কাজে লাগবে।
জোরে চলো! জোরে!
প্রায় চূড়ার কাছে এসে গেছি!
আরও হরিব!
ম্যামথ-যোদ্ধাদের সঙ্গে লড়াই করছে!
5-14 #2462

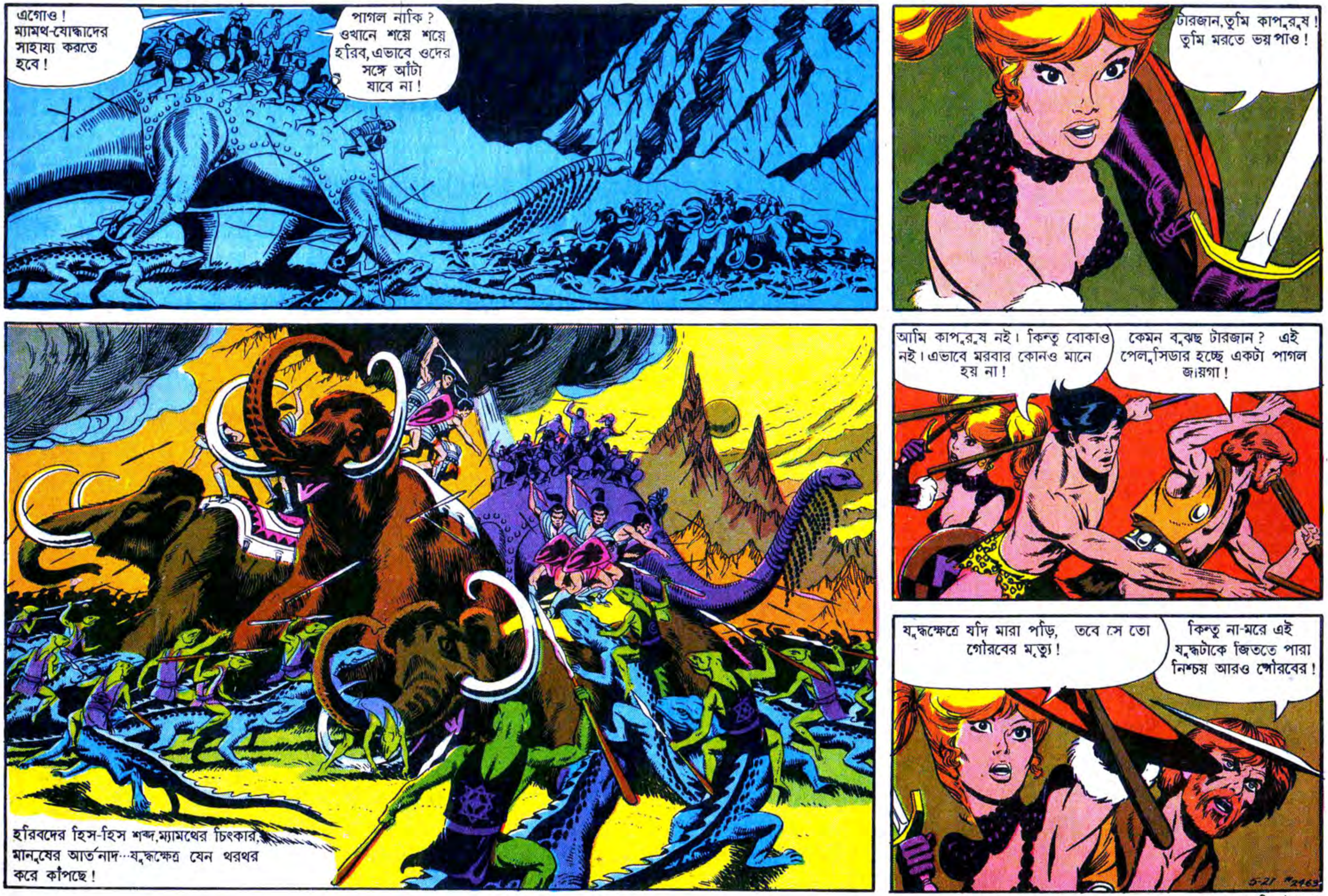

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

শব্দ সন্ধান

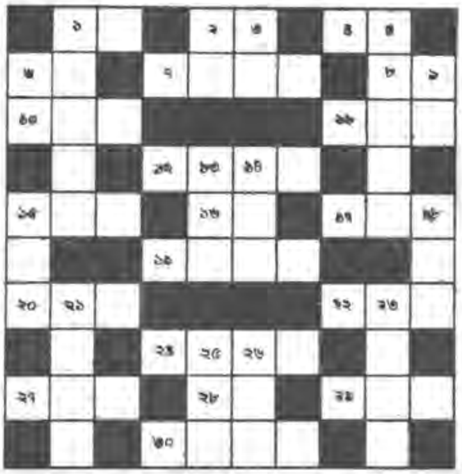

সংকেত : পাশাপাশি : (১) বন্ধুতার বিপরীত (২) ভঙ্গুর জিনিস। (৪) হাতি। (৬) শূন্যস্থান পূরণ করো : 'বনের পশু কি সহজে মানুষের—মানে ?' (৭) পৌরাণিক রাজা, ব্যাস-বাক্যে দ্বিগু সমাসও হতে পারে। (৮) রথের সঙ্গে থাকে। (১০) ছোট নৌকো। (১১) জলজন্তু। (১২) আদর্শ গুরুভক্তির জন্য খ্যাত। (১৫) বীরমাতা হয়েও এঁকে দাসীবৃত্তি করতে হয়েছিল। (১৬) শব্দের পরে বসলে কোনো-কিছু বহন করে। (১৭) কাম্বে উপসাগরের তীরে ছোট বন্দর। (১৯) সুগন্ধী ফুল। (২০) গোয়েন্দা গল্প-উপন্যাসের বিষয়। (২২) মেরাপ বাঁধতে লাগে। (২৪) সূর্যের আর-এক নাম। (২৭) যুদ্ধাস্ত্র। (২৮) সাপের শোভা। (২৯) ছোট পাখি। (৩০) হামেশা।

উপর-নীচ : (১) মহাভারত-কথক। (২) শরতের ফুল। (৩) রাজারও থাকে, নদীরও থাকে। (৫) কলম আর কুড়ুল দুই-ই চালিয়েছেন। (৬) মেদ। (৯) জানলায় থাকে। (১৩) স্কন্ধকাটা। (১৪) তবলার কেরামতি। (১৫) মূল্যবান মণির আকর এক পর্বত। (১৮) সাপের শত্রু। (২১) রামায়ণের মহাবীর। (২৩) ভারতীয় দার্শনিক, পাণিনি-ব্যাকরণের ভাষ্যকার। (২৫) ভৃত্য। (২৬) প্রথম পরমাণুবাদী ভারতীয় মুনি।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

■	খ	দ	■	■	■	■	উ	কো	■
না	■	ব	রা	হ	মি	হি	র	■	র
গ	ম	■	না	ন	কি	ং	■	বা	জ
কে	য়ূ	র	■	ন	র	■	ন	ব	নী
শ	র	■	কা	■	■	ন	■	র	গ
র	■	লে	ক	স	পী	র	র	■	ন্ধা
■	তু	ফা	ন	■	■	ন	বা	ম	■
কেঁ	■	লি	■	রি	প	■	ব	■	সি
চো	ল	■	কু	ক	লা	স	■	ব	ন্ধু
■	গি	র	■	শ	শ	■	পি	ক	■

ধাঁধা

ছোট্‌কার গলায় গুনগুন গান শুনেই বুঝতে পারলাম যে, মেজাজটা ভাল রয়েছে।

ধাঁধা চাইতে এসেছি, ছোট্‌কা জানে। আমায় দেখেই গুনগুন করে গেয়ে উঠল—'তুমি এ-পার ও-পার করো কে গো ওগো খেয়ার নেয়ে?'

এক লাইন গেয়েই ছোট্‌কা বলল, "কার লেখা গান, সতুবাবু?"

"রবীন্দ্রনাথের।" আমি একটুও না-ভেবেই বলে ফেলি। খুবই চেনা গান।

"হুঁ।" ছোট্‌কা ছোট করে জবাব দিল। তারপর সুর পালটে আবার গুনগুন করে গাইতে লাগল, "আমি তরী নিয়ে বসে আছি নদীকিনারে, কে যাবি পারে, ওগো তোরা কে।"

আবার প্রশ্ন, "এটা কার গান?"

"রবীন্দ্রনাথের।" এবারেও আমি চটপট উত্তর দিই।

"বেশ।" ছোট্‌কা এবারও ছোট করে উত্তর দিল। আমি ধাঁধার কথা বলতে যাব, দেখি ছোট্‌কা আরেকটা গান ধরে ফেলেছে—"তরীতে পা দিইনি, আমি পারের পানে যাইনি গো, যাইনি। ঘাটেই বসে কাটাই বেলা—"

"এটা?" আচমকা থেমে গিয়ে আবার জিজ্ঞাসা করল ছোট্‌কা।

ছোট্‌কাকে যে কেন এত গানে পেয়েছে, কে জানে! আমি আবার বললাম, "এটাও রবীন্দ্রনাথের।"

"চমৎকার।" ছোট্‌কা বলল, "আর এটা?" বলেই আবার গুনগুন, "দিন তো গেল, সন্ধ্যা হল, পার করো আমারে।"

"সবই রবীন্দ্রনাথের।" আমিই থামিয়ে বলি ছোট্‌কাকে।

সঙ্গে-সঙ্গে হো-হো করে হেসে উঠল ছোট্‌কা। "হল না, হল না। এটা কাঙাল হরিনাথের।"

কে যে কাঙাল হরিনাথ, আমার জানা নেই। আমি তাই কথা না বাড়িয়ে জানতে চাই, "ধাঁধা দেবে না ছোট্‌কা?"

ছোট্‌কা বলল, "এটাও কি ধাঁধা নয়, সতুবাবু? কেমন ঠকে গেলে বলো?"

আমি চুপ করে থাকি। তাই দেখে ছোট্‌কা বলল, "নৌকো আর পারাপার—এই নিয়েই এবারের প্রথম ধাঁধা। তাই একটু মজা করছিলাম। লিখে নাও সতুবাবু।"

আমি খুশি মনে কাগজকলম নিয়ে বসি। ছোট্‌কা বলে যেতে থাকে।

প্রথম ধাঁধা ॥ শ্রীযুক্ত ক ও তাঁর মেয়ে কণা, শ্রীযুক্ত খ আর তাঁর মেয়ে খনা, শ্রীযুক্ত গ ও তাঁর মেয়ে গোপা—এই ছ-জন এক নদীর ধারে পৌঁছেছেন। ছোট্ট নদী। সেখানে একটি মাত্র নৌকো। দু-জন মানুষ চড়তে পারে নৌকোটায়।

দু-জন দু-জন করে পার হয়ে যাওয়া যেত। কিন্তু মেয়েরা অদ্ভুত একটা গোঁ ধরল।

তারা ঠিক করল নিজের বাবা উপস্থিত না থাকলে অন্যের বাবার সঙ্গে তারা কেউ তীরে থাকবে না, নৌকোতেও চড়বে না। তবে অন্য কোনো মেয়ের সঙ্গে নৌকোয় চড়তে বা তীরে থাকতে আপত্তি নেই।

বলতে পারো, এই শর্ত মেনে নিয়ে কীভাবে পার হবে তারা?

দ্বিতীয় ধাঁধা ॥ একজন ফলওয়ালা দুটো তরমুজ বিক্রি করছে। একটা তরমুজ অন্যটার থেকে চার ভাগের এক ভাগ বড়। বড় তরমুজটার দাম ছোটটার থেকে দেড় গুণ বেশি। কোন্‌টা কেনা লাভজনক?

তৃতীয় ধাঁধা ॥ এমন একটা সংখ্যা বলতে পারো, যার বর্গফলকে উল্টে নিয়ে যদি ফের বর্গমূল বার করা যায় তাহলে যে-সংখ্যাটি পাওয়া যাবে, সেটি হবে মূল সংখ্যার আমূল উল্টো?

চতুর্থ ধাঁধা ॥ শূন্যস্থানে উপযুক্ত সংখ্যা বসাও—

১১১২, ২২২৩, ৩৩৩৪, ৪৪৪৫ ৫৫৫৬, —?

গতবারের উত্তর ॥ (১) বৃদ্ধ প্রপিতামহের জন্ম ১০-১-১৭২২, প্রপিতামহের জন্ম—১০-২-১৭৬৪, পিতামহের জন্ম—১০-৩-১৮০৬, পিতার জন্ম—১০-৪-১৮৪৯, ভদ্রলোকের জন্ম—১০-৫-১৮৯৪, তাঁর ছেলের জন্ম ১০-৬-১৯৩৬ তারিখে। এই শতাব্দীতে, বর্গ হয় এমন সাল— ১৯৩৬। সেইখান থেকে পিছিয়ে যেতে হবে, তাহলেই উত্তর করা সম্ভব।

(২) ৫ কিলোমিটার হাঁটতে হবে ছেলেটিকে।

(৩) মানচিত্রে এমন জায়গা দেখা যায়।

(৪) উপযুক্ত সংখ্যাটি হল—১৩। একেবারে দু-ধারের সংখ্যা দুটো যোগ করলেই প্রতি ক্ষেত্রে মাঝের সংখ্যাটি পাওয়া যায়

ছবি অহিভূষণ মালিক

সত্যসন্ধ

কিসের ফোটো

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যায় ছিল ফাউন্টেনপেনের নিবের পিছন-দিককার ফোটো   ফোটো তপন দাশ

উত্তর বটে

প্রঃ বন্ধুর দাদু মারা গেছেন, মা তোমাকে বললেন সান্ত্বনা জানিয়ে বন্ধুকে একটি চিঠি লিখতে। তুমি কী লিখবে ?

উঃ আমি মাকেই বলব লিখে দিতে, কারণ "শান্তনা" বানানটা আমার কিছুতেই মনে আসে না।

প্রঃ তাসের সঙ্গে সার্কাসের কোথায় মিল বলো তো ?

উঃ দুটোতেই জোকার আছে।

প্রঃ মহাভারতে কোন্ ইঞ্জিনিয়ার বিরাট মাঠের সঙ্গে ব-দ্বীপ জুড়ে দিয়েছিল ?

উঃ ময়দানব।

প্রঃ সাত দুগুনে চোদ্দর চার নামলে হাতে কী থাকে ?

উঃ আগে পেনসিল থাকত, এখন থাকে ডটপেন।

প্রঃ সন্ধি করো, অর্ধ + এক।

উঃ দেড়।

প্রঃ সন্ধি বিচ্ছেদ করো, কোন্ কোন্ শব্দ যোগ করে ধনুষ্টঙ্কার হয় ?

উঃ পায়ের সঙ্গে রাস্তার পেরেকের।

প্রঃ কর্মকারকের একটি উদাহরণ দাও।

উঃ সুধীর কর্মকার।

সুসেন

মজার খেলা

এবারের খেলার জন্যও চাই রবার ব্যান্ড। আর চাই খেলাটা দেখাবার জন্য অল্প অনুশীলন।

বাঁ হাতের তর্জনীতে রবার ব্যান্ডটা গলিয়ে দাও। এবার মধ্যমার তলা দিয়ে ঘুরিয়ে এনে ব্যান্ডটার খোলা মুখ ফের পরাও তর্জনীতে। ছবি দেখলে ব্যাপারটা স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

এইবার বন্ধুদের কাউকে বলো তর্জনীর মথাটা সে যেন আঙুল দিয়ে চেপে ধরে। এই অবস্থায় হাতের ওপর একটা রুমাল চাপা দিয়ে বন্ধুটিকে বলো, "তর্জনীটার মুখটা তুমি আঙুল দিয়ে চেপে রেখেছ। রবার ব্যান্ডটা দু-আঙুলের মধ্যে প্যাঁচানো। তা সত্ত্বেও অনুগত এই রবার ব্যান্ডটাকে আমি ইচ্ছে করলেই বের করে আনতে পারি।" এই বলে ডান হাতটা রুমালের তলায় নিয়ে গিয়ে সত্যি-সত্যি রবার ব্যান্ডটাকে বার করে এনে দেখাও।

খুব সোজা কাজ। শুধু লক্ষ রাখতে হবে, রবার ব্যান্ডটা যখন তর্জনী থেকে টেনে মধ্যমা ঘুরিয়ে টেনে আনছ তখন যেন ব্যান্ডটাতে কোনো পাক বা প্যাঁচ না পড়ে। বাকিটা অনায়াস। রুমালের তলায় হাত নিয়ে গিয়ে মধ্যমা থেকে ব্যান্ডটা খুলে নিলেই ওটা তর্জনী থেকে আপনা-আপনি বেরিয়ে আসবে। আঙুলের মুখ বন্ধু চেপে ধরা সত্ত্বেও কোনো অসুবিধে হবে না।

১

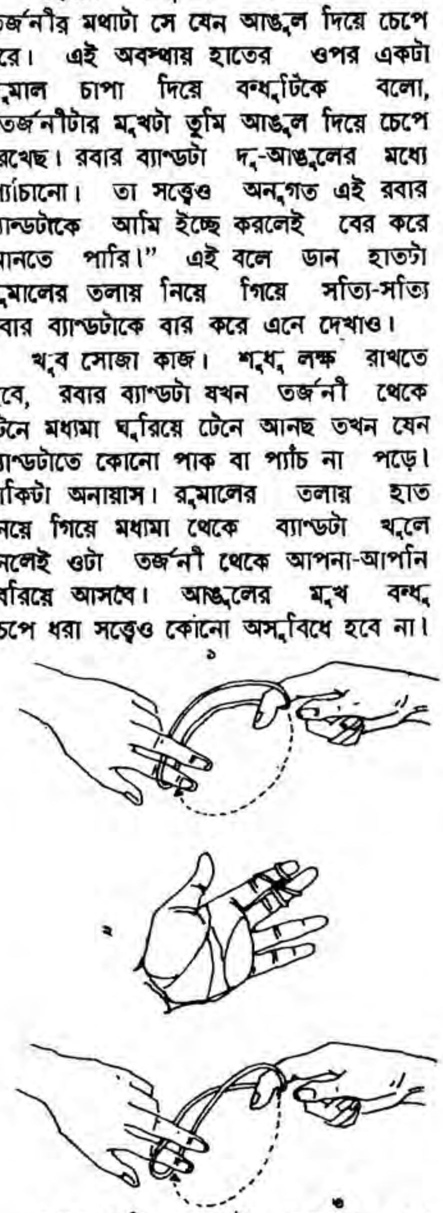

২

৩

বন্ধুরা যদি খেলাটা দেখাতে চায়, তাহলে তুমি ব্যান্ডে একটা ছোট্ট পাক দিয়ে দেবে। ৩ নং ছবি দেখে বুঝে নাও ব্যাপারটা। তাহলে সে কিছুতেই ব্যান্ডটাকে বার করতে পারবে না।

মজারু

আটখানা

প্রতিপক্ষের আক্রমণকে সামাল দেওয়ার জন্য কীভাবে নিজেকে তৈরি করতে হয়, গতবারে কারাটের একটি ভঙ্গিতে তোমাদের দেখিয়েছি। এবারে, সেই মার-খাওয়া ছেলেটি চকিতে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে আক্রমণকারীকে লাথি মারছে। এই মারের সময় তার সমস্ত শরীর কেমন কঠিন হয়ে উঠেছে, লক্ষ করো। কোনো ছুটির দিনে ঘরে বসে আটখানা দিয়ে তোমরা কারাটের এই ভঙ্গিটা তৈরি করতে পারো কি না, একবার চেষ্টা করে দ্যাখো।

সমাধান আগামী সংখ্যায়

গত সংখ্যার সমাধান

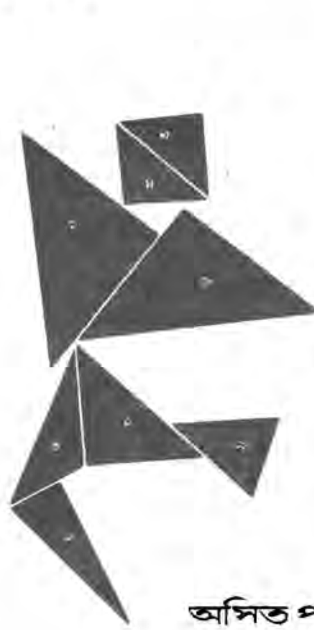

অসিত পাল

আহা, কুট্টুস কী ভাল!
না কুট্টুস, এখন আর খেলা নয়!
ক্যাপ্টেনকে অত চিন্তিত দেখাচ্ছে কেন? ব্যাপার কী?
মানিকজোড় কোথায় গেল?
কী জানি! ডাকো তো!
জনসন! রনসন!
না, না, চিন্তা কোরো না, কুট্টুস এটা আবার ফিরিয়ে এনেছে!
না না, আর আমার সহ্য হচ্ছে না!
ক্যাপ্টেন! ক্যাপ্টেন!
হাত না-চালালে আমার রাগ পড়বে না!
ওরেব্বাবা, আকাশ ভেঙে পড়ল নাকি?

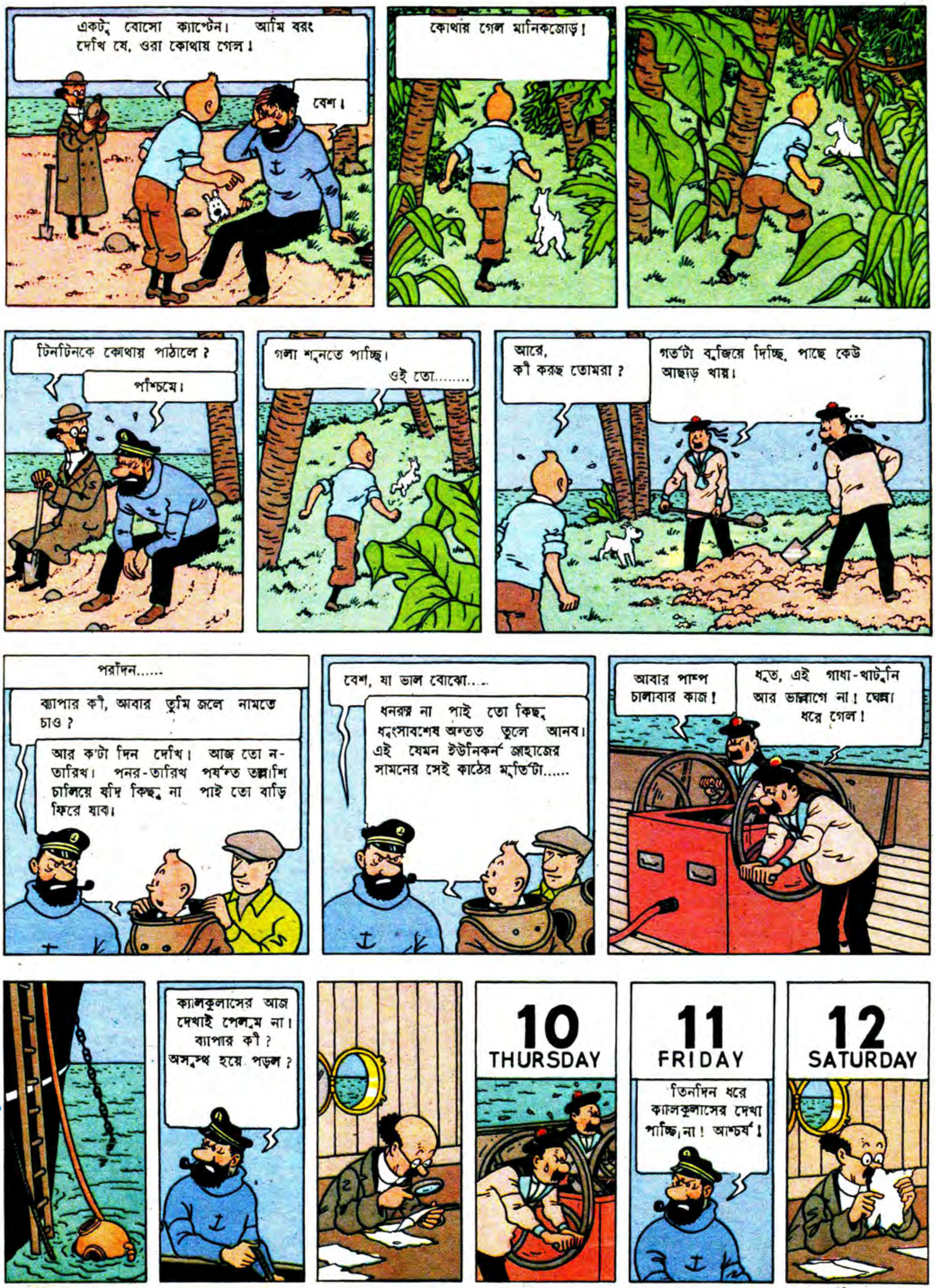

(এর পর চৌত্রিশের পাতায়)

টুম্পা ও ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী

সুব্রত নিয়োগী

টুম্পাকে হয়ত তোমরা চিনবে না। ফুটফুটে মেয়ে টুম্পা। কলকাতার কাছেই একটা ছোট্ট সুন্দর জায়গায় টুম্পা ওর বাবা-মা'র সঙ্গে থাকে। নাম-পাতাপাতি খেলায় ইস্কুলে কেউ টুম্পার সঙ্গে পারে না। হাওড়া স্টেশন থেকে ইলেকট্রিক ট্রেন শাঁখের মত আওয়াজ করে ছাড়বার পর দুটো স্টেশন পেরুলেই যে স্টেশন, সেই স্টেশনের পাশেই টুম্পাদের লাল রঙের ছোট দোতলা বাড়ি। ছাদের ওপর পায়রার ব্যোমের মতো টেলিভিশনের অ্যাণ্টেনা।

টুমপাদের বাড়ির পেছনে সুন্দর ফুলের বাগান। একটু দূরে জল-টলটল দিঘি। দিঘিতে শালুক ফুল, হাঁস। সন্ধে-বেলায় ঝিরঝিরে হাওয়া দিলে বাতাসে হাঁসের গায়ের গন্ধ পাবে।

টুমপা সুন্দর ফুটফুটে মেয়ে হলেও মাঝে-মাঝে হাত না ধুয়ে খাবার টেবিলে বসে পড়ে। যখন-তখন দাঁত দিয়ে নখ কেটে ফেলে। অঙ্ক করতে বসে শক্ত অঙ্ক মাথায় না-ঢুকলে পেন্সিলের পিছনটা চিবুতে থাকে। বৃষ্টি পড়লে বাগানে গিয়ে বৃষ্টিতে ভিজতে চায়। রাত্রে শুতে যাবার আগে কিছুতেই চুল বাঁধতে ইচ্ছে করে না টুম্পার।

এসব দেখলে বড়দের রাগ হয় না, বলো? টুম্পাকে তাই টুম্পার মা প্রায়ই বকেন।

তোমরা কোন দিন ইলেকট্রিক ট্রেনে করে বিকেলের দিকে টুমপাদের স্টেশন দিয়ে গেলে ঠিক তোমরা টুমপাকে দেখতে পাবে দুটো বেণী দুলিয়ে বাগানে ঘুরে বেড়াচ্ছে।

তখন টুম্পার অ্যানুয়াল পরীক্ষা হয়ে গেছে। পড়াশুনো নেই। শীতকাল ছিল বলে কুয়াশায় ভরে গেছে বাগান। একদিন খুব ভোরে ওদের পেছনের বাগানে বেড়াতে-বেড়াতে টুমপা হঠাৎ অবাক হয়ে দেখল, কে যেন নিমগাছের মাথায় কথা বলছে। একেবারে মানুষের মতো গলা।

টুমপা তো থ। দুটো পাখি অনবরত নিজেদের মধ্যে কথা বলছে। এরকম পাখি টুমপা জীবনে দেখেনি।

টুমপা ঘাড় উঁচু করে পাখি দুটোকে ভাল করে দেখতে চেষ্টা করে। আরে, এ তো ঠিক 'ঠাকুরমার ঝুলি' বইয়ের ছবিতে দেখা ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর মতো দেখতে। সেই রকম লম্বা ঠোঁট, বড় বড় চোখ আর বিজ্ঞের মতো মুখের ভাবসাব। নখ-অলা পা নিয়ে গাছের ডাল চেপে ধরে আহ্লাদে দোল খাচ্ছে।

অবাক হয়ে পাখি দুটোকে দেখতে থাকে টুম্পা। চোখের পলক পড়ে না।

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী টুম্পাকে দেখতে পেয়ে মাথা দোলায়। চোখ পিটপিট করে। গলায় অদ্ভুত গর-গর শব্দ করে।

টুম্পা মাথা ঝাঁকিয়ে, ছোট্ট বেণী দুলিয়ে বলে, "আমার নাম টুম্পা।"

পাখি দুটো একসঙ্গে গলা মিলিয়ে মানুষের মতো বলে ওঠে, "আমরা ব্যাঙ্গমী-ব্যাঙ্গমী।"

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীর মানুষের মতো গলা শুনে খুব মজা লাগল টুম্পার। ও জানে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী মানুষের মতো কথা বলতে পারে। টুম্পা জিজ্ঞেস করল, "তোমরা কি ঠাকুরমার ঝুলির ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী?"

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী হৈহৈ করে বলে উঠল, "হ্যাঁ-হ্যাঁ, আমরা ঠাকুরমার ঝুলির ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী।"

টুম্পা অবাক হয়ে বলল, "তোমরা এখানে কেন? তোমাদের তো এখানে কখনও দেখিনি!"

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী কান্না-কান্না গলায় বলল, "আমরা এখানে কাজ খুঁজতে এসেছি—আমাদের মনের মতো কাজ, কিন্তু একটাও মনের মতো কাজ পাচ্ছি না।"

টুম্পা বলল, "ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী কী ধরনের কাজ করতে পারে আমি তো জানি না। তা ছাড়া আজকের দিনেও যে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী থাকতে পারে, আমি ভাবতেই পারি না।"

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী ঠোঁট আকাশের দিকে তুলে হাহা করে হেসে ওঠে। তারপর বলে, "তুমি ঠিকই ধরেছ, কী করে যে আমরা এই সময়ে জন্মে গেলাম আমরা নিজেরাই জানি না!"

টুম্পা বলল, "এখনকার দিনে থাকতে তোমাদের কষ্ট হবে না?"

"কষ্ট তো হবেই, আজকাল রাজপুত্র, কোটালপুত্র, রাক্ষসী-টাক্ষসী নেই বলে কেউ আমাদের দর দেয় না। আমাদের ভারী দুঃখ।"

বলেই ঘাড় গুঁজে হুহু করে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী কাঁদতে লাগল।

টুম্পা বলল, "চুপ, চুপ, তোমাদের কান্না কেউ শুনতে পেলে ঠিক দেখতে পেয়ে ধরে নিয়ে গিয়ে চিড়িয়াখানায় সাদা বাঘের পাশে আলাদা খাঁচায় আটকে রাখবে।"

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী দুজনে এক পা তুলে আঙুল নেড়ে বলল, "না না, আমরা কিছুতেই চিড়িয়াখানায় যাব না। চিড়িয়া-খানায় বাঘের গায়ে বড় বোটকা গন্ধ। কাছে গেলেই গা গুলোয়।"

টুম্পা বলল, "তাই তো, বড়ই চিন্তায় ফেললে। তোমাদের কোথায় রাখি বলো তো।"

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী বলল, "তার চেয়ে বরং তুমি আমাদের তোমার বাড়িতে নিয়ে চলো। আমরা দুজনেই তোমার খুব পোষ মেনে গেছি।"

টুম্পা বলল, "বাড়িতে নিয়ে গেলে মা খুব রেগে যাবেন। বাড়িতে পাখি-টাখি নিয়ে যাওয়া মা একেবারে পছন্দ করেন না।"

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী বলে উঠল, "কেন কেন, আমরা কি খুব বিচ্ছিরি?"

টুম্পা বলল, "না না, তা কেন, তবে—"

বলেই গালে হাত দিয়ে কী সব ভাবতে লাগল।

তারপর চুপিচুপি ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী দুটোকে বাড়ির ভেতর নিয়ে এল টুম্পা। তখনও টুম্পার বাবা ঘুমুচ্ছেন। টুম্পার মা রান্নাঘরে চা তৈরিতে ব্যস্ত।

পিছনের গেট দিয়ে বাড়িতে ঢুকে পা টিপে-টিপে টুম্পা বসবার ঘরে চলে আসে। ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী দুটো ভীষণ চালাক। বাড়ির ভেতর ঢুকে একটুকু শব্দ করল না।

ঘরের একধারে স্ট্যান্ডের উপর টুম্পার বাবার নতুন কেনা টেলিভিশনটা রয়েছে। পর্দার উপর আবছা নীল স্ক্রীন। সন্ধে-বেলায় টুম্পার বাবা যখন রমেনকাকুদের বাড়ি তাস খেলতে যান, টুম্পার মা টি-ভিটা চালান। নাচ, গান, কুইজ কনটেস্ট, খেলা, সিনেমা এসব দেখেন, টুম্পার মা। টুম্পা তখন লেখাপড়া করে। লেখাপড়া হয়ে গেলে টুম্পাও যায় টি-ভি দেখতে।

টুম্পা ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমীকে বলল, "তোমরা দুজন ওই টি-ভির ভেতর ঢুকে যাও।"

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী তো কখনও টি-ভি দেখেনি, তাই অবাক হয়ে ওরা টি-ভি দেখছিল।

টুম্পা বলল, "কই, তোমরা ঢুকে যাও!"

ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী প্রথমে একটু হকচকিয়ে গেল। তারপর বুঝতে পেরে শরীরটাকে এত্তটুকুন করে টি-ভির ভেতর ঢুকে গেল।

খুব মোটা নয় বলে ওরা টি-ভির ভেতর দিব্যি থেকে গেল। টুম্পার বাবা-মা বুঝতেই পারলেন না।

সন্ধেবেলা টি-ভি শুরু হলে যত কথাবার্তা, গান-টান সব এখন ওই ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী দুটোই করে। ওরা নানারকম গলার স্বর করতে পারে তো। নতুন কাজ পেয়ে ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী দুটো ভারী খুশি।

আর রোজ খুব ভোরবেলায় যখন দিনের প্রথম ট্রেন টুম্পাদের বাড়ির পাশ দিয়ে যায়, টুম্পার বাবা-মা যে-সময় ঘুমোন, তখন ব্যাঙ্গমা-ব্যাঙ্গমী দুটো টি-ভি থেকে বেরিয়ে টুম্পার সঙ্গে খেলা করে, গল্প করে রাজপুত্রের, কোটাল-পুত্রের, রাক্ষসীর।

ছবি বিমল দাশ

(একত্রিশের পাতার পর)

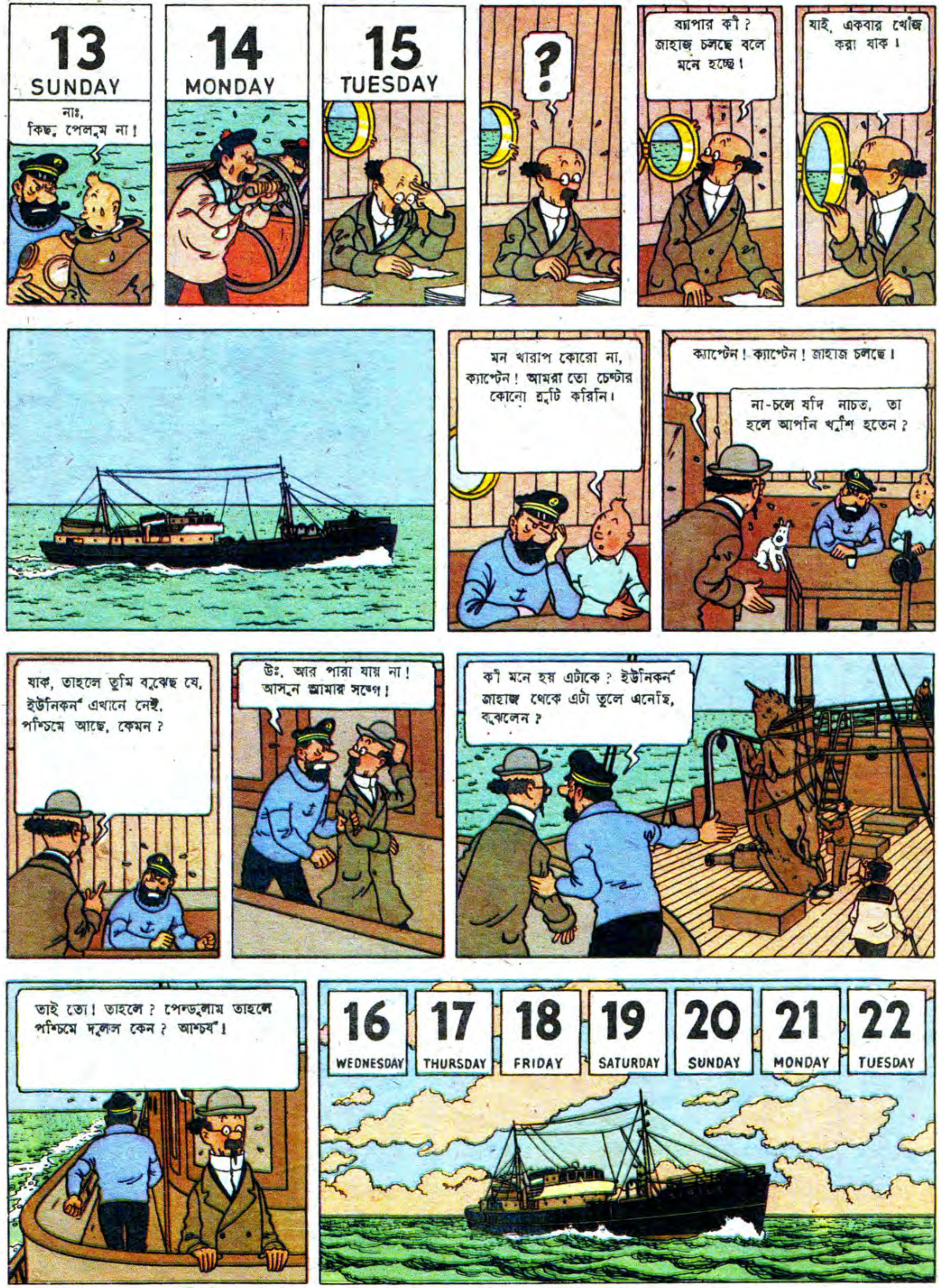

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

(এর পর আগামী সংখ্যায়)

উপন্যাস

ভুতুড়ে কুকুর

আশাপূর্ণা দেবী

আগে যা ঘটেছে

বজ্রাঙ্গসুন্দরের বয়স সত্তরের বেশি। ছবির মতো বাড়ি করেছেন। কুকুর পুষবার শখ ছিল, কিন্তু জ্যাঠাইমা সিংহবাহিনীর জীবদ্দশায় তা হবার উপায় নেই। হঠাৎ একদিন বৈকালিক ভ্রমণ সেরে বাড়ি ফিরে একটি কুকুর দেখতে পান। মস্ত অ্যালসেশিয়ান, কিন্তু বেওয়ারিশ। না-পুষলেও খাবার দিতে দোষ নেই। কিন্তু খাবার দিতে গিয়ে দেখা গেল, কুকুর বেপাত্তা। বজ্রাঙ্গ তাকে ছড়ি দিয়ে খোঁচা মেরেছিলেন। সেইজন্যেই সে অভিমানে উধাও হল নাকি? রাত্তিরে তাঁর আলমারির গোপন গহ্বরে কী দেখেন বজ্রাঙ্গ? তাঁর মশারিতেই বা কিসের খোঁচা? জামাতা গোবিন্দ-গোপালই বা রাত্তিরের খাওয়ার পরে বাগানের মধ্যে কুকুর দেখল কেন? গোবিন্দগোপাল বাড়ি ছেড়ে চলে গেল। তারপরেই টেলিগ্রাম গেল বেনারসে, বজ্রাঙ্গর ভাই সর্বাঙ্গ-ডাক্তারের কাছে। ভৈরব পণ্ডিতকে সঙ্গে নিয়ে তিনি কলকাতায় এসেছেন। তারপর...

রিংকু দেখল, পরিস্থিতি অদ্ভুত। রিংকুকে দেখে দাদু দিদা ঝাঁপিয়ে এলেন না, যেমন ভাবগম্ভীর মুখে বসে ছিলেন, তেমনি বসে রইলেন। এমন কী, সিংহবাহিনী বটব্যাল পর্যন্ত ফটিককে দেখে চেঁচিয়ে উঠলেন না—এতক্ষণ কোথায় ছিলি রে মুখপোড়া?

ব্যাপার বেশ 'গুরুচরণ' বলেই মনে হচ্ছে।

অনেক চেষ্টায় একবার মার কাছাকাছি সরে এসে রিংকু আস্তে বলে, "কে ও?"

"জ্যোতিষী-ঠাকুর।"

"কী করবে ও?"

"গণনা করে বলে দেবে জ্যাঠামশাইয়ের যথাসর্বস্ব কোথায় গেছে, কে নিয়েছে।"

"ইশ্, গুনে অমনি বলে দিলেই হল! অত সোজা নয়।"

"এই চুপ, চুপ!"

"কে এনেছে ওকে?"

"কাশী থেকে তোমার দাদু-দিদা।"

"কেন?"

"তোমার কত্তামা আসতে বলে টেলিগ্রাম করিয়েছিলেন।"

"ও অত কলা খাচ্ছে কেন?"

"'ও' কী আবার? ছিঃ! 'উনি' বলো।"

"ঠিক আছে বাবা। উনি অত কলা খাচ্ছে কেন?"

"ওই ওঁর নিয়ম। একসঙ্গে বসে ষোলটা কলা খেয়ে নিয়ে গণনা করতে বসলে গণনা নাকি ষোল আনা ঠিক হয়।"

"মেয়েদের মতন টিপ্ পরেছে কেন উনি?"

"কাশীর পণ্ডিতরা অমন পরেন। চুপ কর তো।"

রিংকু একটু চুপ করে থেকে আবার বলে ওঠে "গুনে বলে দেবে, না হাতি!"

ভৈরব ততক্ষণে আসন থেকে উঠে পড়েছেন সেই ষোল-কলার ষোল খোশা দুহাতে সাপটে নিয়ে ফেলে দেবার ভঙ্গিতে।

আর সবাই হাঁ হাঁ করে ওঠে, "আপনি কেন? আপনি কেন?"

ভৈরব পণ্ডিত ইশারায় নিবৃত্ত করেন তারপর বলেন, "এ-বাড়ি থেকে উত্তর দিকটা কোন দিক্?"

"উত্তর দিক।"

সকলে মিলে একসঙ্গে দেখিয়ে দেয়।...কিন্তু উত্তর দিক দিয়ে কী হবে? মুখ-চাওয়া-চায়ি চলে।

ভৈরব মৃদু হাসি হেসে সকলের না-বলা প্রশ্নের জবাব দেন। যার অর্থঃ উত্তর দিকে খোশা ফেললে ঠিক-ঠিক উত্তর মিলবে।

উত্তর দিকের সঙ্গে উত্তরের এমন যোগাযোগ আছে কে জানত? স্কুলে রিংকু কোন্-মুখো বসে টিফিনে মা যে কলা দুটো দেন (বেশির ভাগ দিনই রিংকু যাদের ফিরিয়ে আনে) সে-দুটোকে খেয়ে ফেলে খোশাগুলো উত্তর দিকে ফেললে ক্লাসে পড়ার উত্তর ঠিক হবে?

খোশাদের ফেলে দিয়ে এসে গঙ্গাজলে হাত ধুয়ে গণনায় বসেন ভৈরব আচার্য!

একদা ভৈরব খাঁটি বাঙালিই ছিলেন, বহুকাল বেনারসে থাকতে-থাকতে অনেকটা বেনারসি হয়ে গেছেন। তাই ভাষায় বেনারসি টান।

সেই টানের সুরে বলেন, "কুকুর গাছে ভি উঠছে, ছাদে ভি উঠছে? বাগানে ভি ঘুরছে? আউর?"

সিংহবাহিনী এখন পালঙ্কশায়িনী। গলার জোর ঈষৎ কম। বলেন, "আউর তো বহুত রয়েছে বাবা। কুকুর দেখা যাচ্ছে না, তবু এমন বিচ্ছিরি ভি চিল্লাচ্ছে যে, বুক ধড়ফড় ভি করছে। কুকুরের কান্না ভি অমঙ্গল জানতা হ্যায় তো? রাতভোর বহুত খুব কান্না করতা হ্যায়। সারারাত ঘুম না হচ্ছে—"

ভৈরব হাত তুলে ভাঙা গলায় হেসে উঠে বলেন, "বাঙ্গালায় বলবেন, বাঙ্গালায় বলবেন। হামি ভি বাঙ্গালি আছি, লেকিন বানারসে থাকতে-থাকতে—"

বাঙালি!

সিংহবাহিনী নিশ্বাস ফেলে বলেন, "বাঁচালে বাবা। তবে এখন বলো, ওই পিশাচে-পাওয়া কুকুরটা কী করে বাড়ি থেকে বিদেয় হবে।"

"হোবে।"

ভৈরব নিশ্চিন্ত গলায় বলেন, "সোব ঠিক কোরে দিবো।"

"দিবে তো একটু তাড়াতাড়ি দাও না বাবা!"

সিংহবাহিনীর স্বর কাতর, রাতভোর ওই বিটকেল কান্নায় ঘুম হয়নি। মাথা বন-বন করে ঘুরছে। ওই পিশাচে-পাওয়া শয়তান কুকুরটা এসে পর্যন্ত সংসারে যে কী দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে। প্রথম তো জামাই রাগ করে ছানার জিলিপি ফেলে রেখে ঝামাপুকুরে চলে গেল। তারপর দামিনী ট্রে-ভর্তি কাঁচের বাসন হাত থেকে ফেলে ভেঙে চুর করল। ধোবা এক বস্তা কাপড় নিয়ে হাওয়া হয়ে গেল। টিউবওয়েলের জল শুকিয়ে আসছে। মশার উৎপাত বেড়েই চলেছে। নতুন বাড়িতে ইঁদুর আরশোলা। যখন-তখন ছাতে কাকের ডাক। কে জানে বাড়ির ছেলে দুটো পাগল-টাগল হয়ে যাচ্ছে কিনা, আর চাঁদের ওপর চুড়ো, হিমালয়ের ওপর গন্ধমাদন, বাড়ির এই বড়বাবুর যথা-সর্বস্ব লোপাট হয়ে গেল। এসব ভুতুড়ে কাণ্ড ছাড়া আর কী?

এমন গড়গড়িয়ে বলে গেলেন সিংহবাহিনী যে, তার মাঝখানে ঢুকে পড়তে আলপিনের আগার ফাঁকটুকুও পেলেন না ভৈরব জ্যোতিষী। কথা শেষ হতে গম্ভীর গলায় বললেন, "এক-এক করে বোলেন মা, আমারও মাথা বনবনাচ্ছে।...আচ্ছা জামাই কেনো রাগ কোরলেন?"

"ওই তো—কুকুর নিয়ে তক্ক।"

"আউর দামিনী কে হল?"

"হল আবার কে? বাসনমাজার লোক ছিল, তাই আছে।

তবে থাকবে না। বাড়ির এইসব ভুতুড়ে কাণ্ড আর কুকুরের কান্না দেখে ঠিক পালাবে। তালে আছে। তাহলে সংসারের কী অবস্থা হবে বোঝো!"

"ও তো ঠিক। তো ইঁদুর আরশুলো মশকে ও ভি কিছু নেই হ্যায়, ও তো হোতাই হ্যায়, লেকিন কৌয়া!" ভৈরব ভুরু কুঁচকে নিজের করতলের রেখা দেখতে-দেখতে বলেন, "কোন্ দিকে বসতা হ্যায়?"

সিংহবাহিনী কড়া গলায় বলেন, "কোন্দিকে আবার? এই হামকো শিরমে! ও, তুমি বাঙালিই। মানে বসে আমারই মাথার ওপর। এই যে এই ঘরের ছাতে—"

"আহাহা! ইশ! ও!" ভৈরব আপসোসের গলায় বলেন, "এ তো ঈশান কোণ হোচ্ছে। বহুত খারাব। একটা যাগ-যজ্ঞ ভি করতে হোবে। কিছু থোড়া খরচা হোবে!"

"তা হোক না খরচ. তুমি ওটি করে দাও বাবা।"

ভৈরব বলেন, "ও তো করনেই চাই। লেকিন—কোন্ লোক পাগল হয়ে গেল?"

সিংহবাহিনী হঠাৎ শোয়া ছেড়ে উঠে বসে রিংকু আর ফটিকের দিকে আঙুল বাড়িয়ে বলেন, "লোক আবার কী? এই ছোঁড়া দুটো—"

রিংকু ছিটকে উঠে বলে, "কত্তা মা, ফের তুমি ওই অসভ্য কথাটা বলছ? সেদিন না বারণ করেছিলাম।"

সিংহবাহিনী অবশ্য এতে দমেন না, সমান তেজের সঙ্গে বলেন, "তা ছোঁড়া বলব না তো কি বুড়ো বলব তোদের?"

"আমরা পাগল হয়ে গেছি?"

সিংহবাহিনী আবার শুয়ে পড়ে নিশ্বাস ফেলে বলেন, "গেছিস কি না-গেছিস তোরাই জানিস। চব্বিশ ঘণ্টা দুটোতে গুজগুজ ফুসফুস! কোথায় যে হাওয়া হয়ে থাকিস, ভগবান জানে; একবার যে ঘরের ছায়া মাড়াস না—"

"ছায়া মাড়াই না! ছায়া মাড়াতে যাব কেন?" রিংকু অবাক, "কখন কোন্ দিকে তোমার ঘরের ছায়া পড়ে জানি আমি?"

"বোকার মতো কথা বোলো না রিংকু," রিংকুর বাবা তাড়াতাড়ি বলেন, "তুমি আর এ-ঘরে আসো না, দিদা সেই কথাই বলছেন।"

রিংকু সত্যিই বোকা বনে গিয়ে বলে, "এঘরে আসি না? যাাঃ!"

সিংহবাহিনীর গলা আবার তেজালো হল, "আসিস কিনা তার সাক্ষী দ্যাখ—"

আঙুল বাড়িয়ে বিছানার ধারের বোতল আর জারগুলি দেখান। সব ভর্তি-ভর্তি। কিসমিস, খেজুর, আমসত্ত্ব, ডালমুট, কাজুবাদাম।

ইশ! সত্যিই তো।

রিংকু প্রায় হতভম্ব হয়েই তাকিয়ে থাকে।

ভৈরব হঠাৎ ফটিককে ইশারায় ডাকেন। আর কাছে এলে তীক্ষ্ম দৃষ্টিতে তার আপাদমস্তক দেখে কিছুক্ষণ নিজের কপাল টিপে বলেন, "সমঝে গেছি। এই লোক খোকাবাবুকে 'গুণ' করছে।"

"কী করছে?" ছিটকে ওঠেন সিংহবাহিনী।

"গুণ! মানে মন্ত্রঃপূত ভি করছে। মানে বশীকরণ ভি করে নিচ্ছে।"

"নিচ্ছে তো?" সিংহবাহিনী কপাল চাপড়ে বলেন, "জানি আমি। তা করছে আজ নাকি? বরাবর করছে। যতকাল ফটকে এসেছে, ফটকে যেন ওর প্রাণ। তুমি হাত গুনে কী বলবে পণ্ডিত, আমি অনেকদিনই বলেছি লক্ষ্মীছাড়াটা আমার খোকাকে গুণতুক্ করেছে। সর্বদা ওর পায়ে-পায়ে।"

"আঃ জোঠিমা—"

বজ্রাঙ্গ বলে ওঠেন, "কী যা-তা বলছ সব?"

সিংহবাহিনী হঠাৎ নিজমূর্তি ধরেন। "যা-তা? তা তো বলবিই। তোরও তো যত লক্ষ্মীছাড়া শয়তানদের ওপর নেকনজর। মাইজে ওই পিশাচে-পাওয়া কুকুরটাকে আদর করে-করে মাংসভাত খাওয়াস!"

বজ্রাঙ্গ ঘরের সকলের দিকে তাকান।

বজ্রাঙ্গের আবার নিজের স্বভাব ফিরে আসে, তেজের সঙ্গে বলেন, "দেওয়াই হয়েছে, খেয়েছে কোনোদিন?"

"খায়নি?"

"মোটেই না। ছোঁয়ওনি।" ফটিক জানে।

সঙ্গে-সঙ্গে তড়বড়িয়ে বলে ওঠে ফটিক, "শোঁকেওনি, খেতে দিলে মুখ ঘুরিয়ে বসেছে। অ এখন তো আর দেখাই যাচ্ছে না, শুধু ওই চেঁচানিই শোনা যায়। কোথা থেকে ডাকে সেটাই রহস্য।"

ফটিক যতক্ষণ কথা বলছে, ভৈরব ততক্ষণই ওকে দেখে চলেছেন। ফটিকের মনে হচ্ছে, তার গায়ে যেন ছুঁচ-টুচ কিছু ফুটছে। কী অশান্তি রে বাবা!

কথা শেষ হতেই ভৈরব জ্যোতিষী বলে ওঠেন, "খাচ্ছিস না? সাচ কথা?"

"না তো কি মিছে কথা বলছি?"

ভৈরব মাথা নেড়ে ভাবগম্ভীর গলায় বলেন, "কুকুর-আদমি মুখের সামনে থেকে মাংস-ভাত ভি খাচ্ছে না, এটা দর্শন করে তাজ্জব লাগেনি আপনাদের?"

বজ্রাঙ্গ নির্লিপ্ত গলায় বলেন, "সে তো লেগেছে—"

"আউর কুছ সন্দেহ না হয়েছে?"

"সন্দেহ আবার কী হবে? মনে হয়েছে ওর নিজের মালিকের জন্যে মন-কেমন করছে।"

"মন-কেমন? হা হা হা!" ভৈরব হেসে উঠে বলেন, "না না, ওটা ঠিক কথা না। আমি দেখতে পাচ্ছি ও কুকুর না আছে, ধর্মোরাজ আছে।"

"কী বললে পণ্ডিত? ও ধর্মরাজ আছে?" সিংহবাহিনী বুড়ো আঙুল বাড়িয়ে বলেন "কচু আছে! ঘোড়ার ডিম আছে! সাদা বাংলায় ও শয়তান ভি আছে। এ সব-কিছু অঘটন ওর জন্যেই ঘটছে। জ্যোতিষ করে বলতে পারো তো বলো, বড়বাবুর সেই যথাসব্বস্ব কোথায় লোপাট করেছে ওই পিশাচে-পাওয়াটা।"

যথাসর্বস্ব! যথাসর্বস্ব।

ভৈরব বুড়ো আঙুলটা কপালে চেপে ধরে বলেন, "কোথায় থাকছিল ওটা? কোন চীজ ছিল?"

"কেউ কিছু জানি না বাবা। একদিন সকালে দেখি বাছা বিছানা থেকে উঠছে না, বুক ধরে শুয়ে আছে, হাঁপাচ্ছে, চোখে জল, কী হয়েছে জিগ্যেস করলে বলে না। হঠাৎ বলে উঠল, আমার যথাসব্বস্ব গেছে।"

বজ্রাঙ্গর অস্বস্তি হচ্ছিল। এতজনের সামনে এসব কথা! সেদিন অবশ্য যখন ওঁর সেই গুপ্ত গহ্বরে হাত ঢুকিয়ে দেখলেন যে, শুধু গহ্বরই আছে, বাক্সটি নেই, তখন তাঁর চিরকালের বজ্রকঠিন বুকটাও গহ্বর হয়ে গেল। মনে হল ত্রিভুবনে তাঁর আর কেউ নেই, কিছু নেই। সারা জীবনের সঞ্চয়. রোজ রাত্রে একবার করে বার করে দেখেছেন। হয়তো আবার কিছু যোগ করেছেন, তুলে রেখেছেন। কত ভেবেচিন্তে প্ল্যান করে দেয়াল-আলমারির পিছনের দেয়ালে ওই গহ্বরটি বানিয়ে নিয়েছিলেন। দাঁড়িয়ে থেকে-থেকে, রাজমিস্ত্রিকে আলাদা বখশিস দিয়ে।...তবুও ভয় হয়েছে, যদি কারুর কিছু

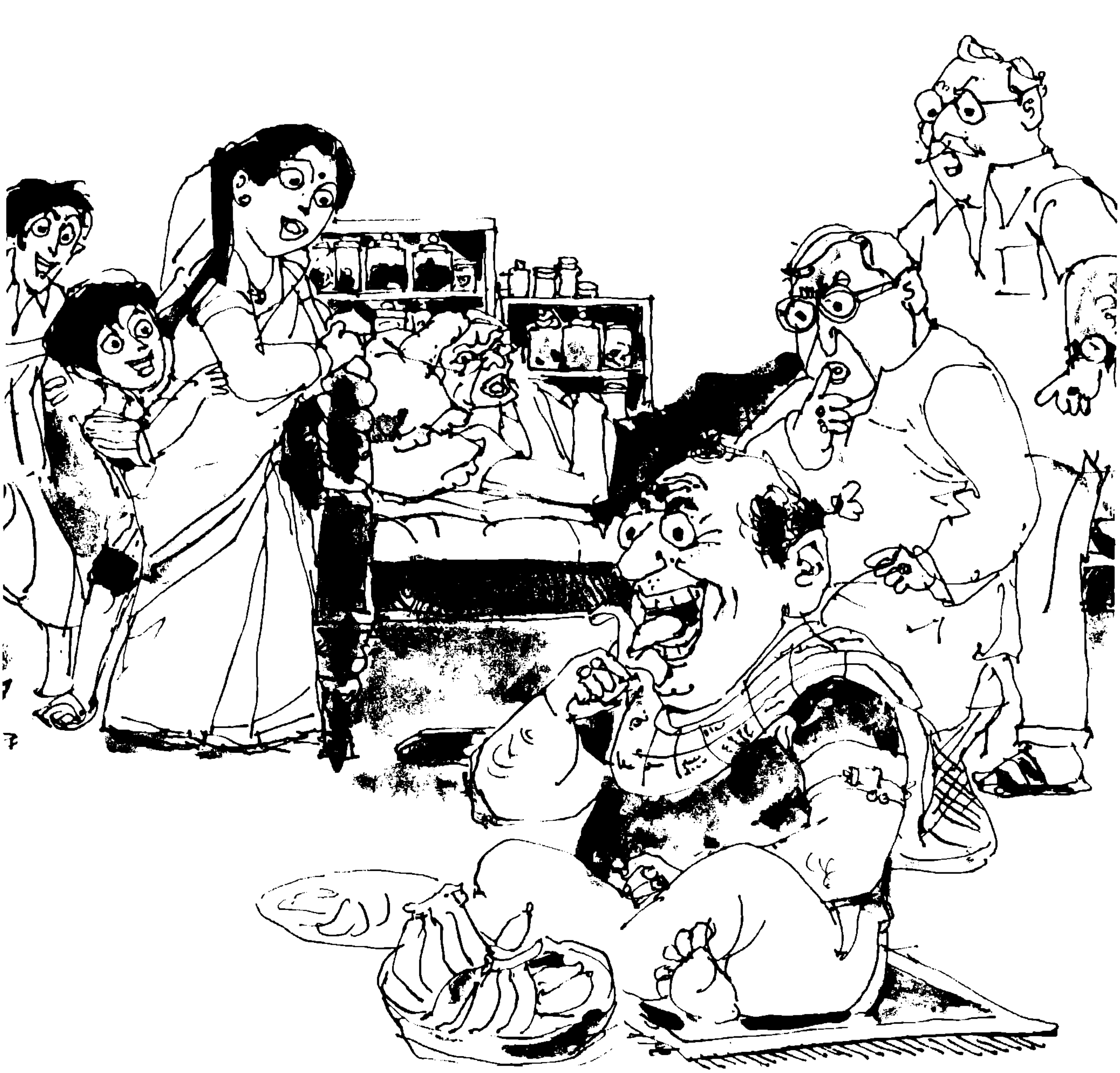

সন্দেহ হয়। তাই বই সাজিয়ে আড়াল করে রেখেছিলেন। ওই সন্দেহের কথা ভেবে ঘরে-ঘরে একই রকমের দেয়াল-আলমারি রেখেছেন। তবু এমন হয়ে গেল। এ ভৌতিক ছাড়া আর কিছুই নয়। এখন জ্যোতিষী যদি গণনার সাহায্যে বলে দিতে পারে আর পাওয়া যাবে কিনা। কোথায় উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে ফেলেছে সেটা।

এখন এত কথায় অস্বস্তি হয়, রেগে-রেগে বলেন, "কোথায় ছিল, কী ছিল, এ-সব যদি আমিই বলে দেব, তো আপনি কী বলবেন? কী করতে এলেন বেনারস থেকে?"

কথায় হিন্দিটান থাকলেও, আসলে তো বাঙালি? ভৈরব একটু গুম হয়ে গেলেন।

এরই ফাঁকে ফটিকচন্দর তড়বড়িয়ে বলে ওঠে, "আচ্ছা বড়দাদু, সব সময় তো বলেন আপনি, যথাসর্বস্ব ঢেলে এই বাড়িটি বানিয়েছি। তাহলে? আবার সে-জিনিস এল কোথা থেকে?"

"কী? কী বললি পাজি, মেরে লাট করি তোকে আয়।" এতক্ষণের বিরক্তির ঝাল ওর ওপরেই ঝাড়েন বড়বাপ। ফটিক ভয় খেয়ে শটকান দেয়। সঙ্গে-সঙ্গে রিংকুও। ফটিকদার অপমান ওর বুকে বাজে।

সিংহবাহিনী এখন রিংকুর মা, বাপ, ঠাকুর্দা, ঠাকুমা সকলের দিকে তাকিয়ে বলেন, "দেখলি? দেখলি তোরা? বল্ গুণতুক করেছে কিনা। বাঁদর—ওর পায়ে-পায়ে ফেরে।"

এখন ভৈরব নাকে নস্যি ঠুসতে-ঠুসতে বলেন, "সব ঠিক মালুম হয়ে গেছে। আপনার যে মালটা চোরি হয়ে গেছে, সেটা এই লোক নিয়েছে।"

অ্যা! অ্যা! অ্যা! অ্যা!

একে-একে নয়, সবাই একসঙ্গে।

ভৈরব বিজয়-গৌরবের গলায় বলেন, "হ্যাঁ, ওই লোক চোর হচ্ছে। মাল পাচার করিয়ে দিয়েছে। এখোন নিজে তাল বুঝে পালাবে।"

"শুনলি বজ্জা? শুনলি? সবু, বৌমা, গোরা, নাতবৌ তোরা সবাই শুনলি? বড়বাবুর প্রাণের পুতুল ফটিকবাবুর গুণ শুনলি?" হঠাৎ একটু হেসে ওঠেন সিংহবাহিনী। বলেন, "ওই মুখপোড়াকে দিয়েই টেলিগ্রাফ করিয়েছিলাম। বললাম বাংলায় লিখে নিয়ে যা, পোস্টোমাস্টার ইংরিজি করে দেবে। টের পায়নি নিজের মিত্যুবাণ নিজে আনাচ্ছে।

... যাক, এখন ওকে আটক করবি কিনা? পুলিসে ধরিয়ে দিবি কিনা?"

ডাক্তার বটব্যাল অবশ্য কিছুই জানেন না, তবু বলে ওঠেন, "পুলিসে দেওয়া যাবে কী করে? ও যে চুরি করেছে তার প্রমাণ দেখাতে হবে তো?"

সিংহবাহিনী ধারালো হন। "প্রমাণ তোরা দেখাবি, না পুলিস দেখবে? বলি এত বড় গণৎকারের কথাটা প্রমাণ হবে না? বানের জলে ভেসে যাবে? উঃ যাই ভাগ্যিস এসেছিলেন উঁন। তাই তো বলি, সেই ভুতো কুকুরটাই যদি তোর যথা-সর্বস্ব উড়িয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে বজা, তো সে এখনো এ বাড়িতে ঘুরবে কেন? রাতভোর কাঁদবে কেন? তোর দুঃখেই কাঁদে বজা। আহা ধর্মরাজ তো!"

বাগানের একধারে জামরুল-তলায় ফটিক আর রিংকুর মধ্যে ওই আলোচনাই চলছে। ব্যাপারটা কি তবে সত্যিই ভৌতিক? রিংকুদের সন্দেহ অমূলক?

কাশীর পন্ডিত কি আর ভুল বলবেন?

ফটিকই বলে, "ভূত ছাড়া অমন ভুতুড়ে কান্না কাঁদে কী করে? তা ছাড়া—হঠাৎ অদৃশ্যই বা হয়ে গেল কেন?"

রিংকু গাছতলা থেকে দুটো শুকনো জামরুল কুড়িয়ে ফটিককে একটা দিয়ে একটা জামরুল খেতে-খেতে বলে, "সব কেন'র মানে বুঝে ফেলেছি রে মাকড়শা, সময় এলেই জানতে পারবি।"

"কী বুঝলি বল্ না রে বক্কাদা।"

রিংকু ধীরেসুস্থে একটা জামরুল শেষ করে নিরীক্ষণ করে দেখে শুকনো পাতার মাঝখান থেকে আর-একটা জামরুল কুড়িয়ে নিয়ে আরও ধীরেসুস্থে তাকে প্যান্টের পায়ায় মুছতে মুছতে বলে, "বুদ্ধিমান গোয়েন্দারা কখনো আগেভাগে তার অ্যাসিসটেন্টকে সব বলে ফেলে না রে, মাকড়শা।"

মাকড়শা মলিনভাবে বলে, "তা সাকরেদই যদি অন্ধকারে রইল কাজ এগোবে কী করে?"

"এগোবে ঠিকই।"

রিংকু জামরুলে কামড় দিয়ে বলে, "একটা কথা শুধু জেনে রাখ মাকড়শা, চালাক চোরেরা কখনো চট করে এমন কিছু করে বসে না, যাতে সন্দেহ সৃষ্টি হয়। একইভাবে অদ্ভুত কান্ড ঘটতে থাকলে লোকের নজর ভূতের দিকেই যাবে। অন্তত ধাঁধায় পড়ে যাবে যে, ব্যাপারটা 'চৌরিক' না 'ভৌতিক'!"

ইশ! ফটিক ওর হাতটা চেপে ধরে, "তোর কী বুদ্ধি রে, বক্কাদা। বুঝে ফেলেছিস?"

"এই যাঃ। দিলি তো ফেলে জামরুলটা?"

"আহা রে, গাছে উঠে দুটো পেড়ে দেব?"

"না না। বাজে। মিষ্টি নয়।"

বাড়ির সকলের সামনে রিংকুকে 'তুই' করে বলে না ফটিক, সাবধানে কথা বলে, নইলে রেগে যাবে সবাই। আড়ালে তারা বন্ধু।

বন্ধুর মতোই গভীর পরামর্শ চলে কী ভাবে কাজ এগোনো যাবে। হঠাৎ দেখা যায় বীরবিক্রমে তেড়ে আসছেন বজ্রাঙ্গসুন্দর ছড়ি হাতে, তাঁর সঙ্গে-সঙ্গে সর্বাঙ্গসুন্দরও।

ছড়িটা উঁচিয়ে বজ্রাঙ্গ চিৎকার করে ওঠেন, "ফটকে, আবার? আবার তুই বসে-বসে ওই ছোট বাচ্চাটার মাথা খাচ্ছিস? বাড়িতে আর জায়গা পাওনি? এই পড়ন্ত রোদ্দুরে বাগানে? রিংকু, চলে যা বলছি এখান থেকে, আমি ওটাকে পুলিসেই দিয়ে আসি।"

সর্বাঙ্গসুন্দরও বলেন, "তাই দরকার। ছেলেটাকে একেবারে 'পয়জন' করে ফেলেছে। নইলে আমরা এলাম, আমাদের সঙ্গে একবার কথা বলল না।"

"যত নষ্টের মূল এইটা।"

বজ্রাঙ্গ ফটিকের কান ধরতে যান। ফটিক 'আঃ' বলে, ফস করে হাত ছাড়িয়ে পালিয়ে এসে দুদ্দাড়িয়ে ছাদে উঠে সেই চিলে কোঠার ঘরে ঢুকে ভিতর থেকে খিল লাগিয়ে হাঁফাতে থাকে।

নীচের তলায় তখন রিংকুকে জেরায়-জেরায় জেরবার করা হচ্ছে। কী কথা হচ্ছিল ফটিকের সঙ্গে? রোজ কী এত কথা হয়? বাড়ির লোককে ছেড়ে সব সময় চাকরের কাছে থাকতে যায় কেন সে?

তবে রিংকু হারবার ছেলে নয়, তার চোটপাট জবাব।

বাড়ির লোক তার সঙ্গে গল্প করে? হয় বলবে 'পড় পড়', নয় বলবে 'খা খা'। বড় দাদু তো আবার শরীর-চর্চা নিয়ে উপদেশ দিতে লেগে পড়বেন। হুঁ!

এরপর ভৈরব জ্যোতিষীর কাছে কাতর প্রার্থনা, ছেলেটাকে একটা কবচ-টবচ দিতে।

কিন্তু ওদিকে কী হচ্ছে?

ডাক্তার বটব্যাল বলে ওঠেন, "তোমাদের পাখি উড়ে পালাচ্ছে না তো?"

"তাই তো, দ্যাখ দ্যাখ।"

গটগট করে উঠে যান সর্বাঙ্গসুন্দর। দরজায় ধাক্কা দেন। নাঃ ভিতর থেকে বন্ধই আছে। তার মানে রাত্তিরের অন্ধকারে পালাবে।...রোসো, তোমার পালানো বার করছি ব্যাটা।

ছাত থেকে হাঁক পাড়েন ডাক্তার বটব্যাল, "একটা তালাচাবি দিয়ে যাও তো কেউ।"

রিংকুর মা বিষণ্ণ মুখে একটা তালাচাবি নিয়ে আসেন। ডাক্তার বটব্যাল সেটা লাগিয়ে টেনে দেখে চাবিটা পকেটে পোরেন। গটগট করে নেমে আসেন। একেবারে কাল সকালে পুলিস ডেকে তবে তালাচাবি খোলা।

কাল সকালে? রিংকুর মা কাঁদো-কাঁদো। "সারারাত ও বেচারা কিছু খাবে না বাবা?"

'বাবা' জোরের সঙ্গে বলেন, "না, খাবে না। আমাদের ডাক্তারি শাস্ত্রে বলে, এক রাত্তির না খেলে কেউ মরে না, বরং জীবনী শক্তি বাড়ে!"

"বিকেলেও বেচারা কিছু খায়নি বাবা।"

"দুপুরে?"

"দুপুরে সেই তো কখন দুটি ভাত খেয়েছিল।"

"ব্যস ব্যাস, ওতেই হবে।"

রিংকুর মা তখন শ্বশুরকে বোঝাতে চেষ্টা করেন. ফটিককে না-খেতে দিয়ে ঘরে বন্ধ করে রাখলে রিংকুও কিছু খেতে চাইবে না।

শ্বশুর বলেন, ওই আহ্লাদ দিয়ে-দিয়েই ছেলেটার মাথা খাওয়া হয়েছে। এবার তিনি ওকে বেনারসে নিয়ে যাবেন, ওখানকার স্কুলে ভর্তি করে দেবেন।

কিন্তু রাত্তিরে যে আর-একজন বাড়িসুদ্ধ লোকের মাথা বনবন করে ঘুরিয়ে দেবার ব্যবস্থা করে রেখেছে, তা কে ভেবেছিল?

নাঃ, কেউ ভাবেনি।

স্বপ্নেও না।

সকালবেলা সবাই যখন চা খেতে বসছে, তখন রিংকুর মা কাতর হয়ে প্রস্তাব করেছিলেন, একবারটির জন্যে দরজা খুলে দিয়ে ফটিককে একটু চা খেতে দিতে।

"বেচারা সকালবেলা 'চা চা' করে অস্থির হয় জ্যাঠামশাই। আপনারা না হয় পাহারা দিয়ে—"

"ঠিক আছে।"

জ্যাঠামশাই রায় দেন. "গোরা, যা চাবিটা নিয়ে। খুলে দিয়ে বেশ শক্ত হাতে ধরে নিয়ে আসবি। যেন হাত ছাড়িয়ে না পালায়।"

"গেটটা বন্ধ করে রাখা হোক না;" ডাক্তার বটব্যাল বলেন. "আগে থেকে প্রিকশান নেওয়া ভাল।"

"ঠিক বলেছিস," বজ্রাঙ্গ গেটে তালা মারতে যান। গৌরাঙ্গ ছাদে তালা খুলতে যায়।...

কিন্তু তারপর?

পরক্ষণেই?

ভয়ঙ্কর একটা আর্তনাদ করে অমন দুদ্দাড়িয়ে নীচে নেমে এসে বুক চেপে ধরে একেবারে শুয়ে পড়েন কেন রিংকুর বাবা?

কেন? কেন? কেন?

চা ফেলে সবাই এসে হুমড়ি খেয়ে পড়ল।

"কী হল? পড়ে গেছিস? কিছু কামড়েছে? হঠাৎ বুকে কষ্ট হচ্ছে?"

অনেক প্রশ্নের একটাই উত্তর শোনা যায়, "ফঃ ফঃ ফটিক।"

"ফটিক! ফটিক মানে?"

ওঃ, বোঝা গেছে। বেটা ফটকে দরজা খোলা পাওয়ার সঙ্গে-সঙ্গেই সারারাত আটকে পড়ে থাকার আক্রোশটা বাবুর ওপর মিটিয়ে নিয়েছে। বুকে ধাক্কা মেরে ছিটকে পালিয়েছে।

(ক্রমশ)

ইং-এর কথা আরও

চামেলিরা যে যা করছে করুক, ততক্ষণ আমরা ইং-এর ব্যাপারটা একটু ভাল করে বুঝে নেবার চেষ্টা করি।

যে-কাজটা এই মুহূর্তে চলছে তার বেলায়—ইং:

You're reading Anandamela.

I'm thinking of you.

আবার, আগে কোনো একটা সময়ে যে-কাজটা চলছিল, তার বেলাতেও—ইং:

Chambal was taking his exam (examination) last week.

Chameli's school-bus was passing the Maidan five minutes ago.

তেমনি, পরে কোনো একটা সময়ে যে-কাজটা চলবে সে কাজেও-ইং:

The sun will be shining again when the cloud passes.

We shall be waiting for you.

তার মানে, বুঝতে পারছ, কোনো একটা চলতি কাজ কিংবা ঘটনা বোঝাতে গেলে ইং লাগে। সেই চলতি ব্যাপারটা এখনকার হতে পারে, আগেকার হতে পারে, আবার ভবিষ্যতে হবে বলে বলা যেতে পারে। তবে ব্যাপারটা খানিকক্ষণ ধরে চলা চাই।

আবার কখনো কখনো ভবিষ্যতের এমন কোনো একটা কাজ বোঝাতেও ইং লাগানো হয়, যে-কাজটার মধ্যে চালু থাকবার ভাবটা নেই। যেমন ধরো, চম্বলের সামনের জন্মদিনে বাবা তাকে কী দেবেন এখন থেকে ঠিক করে রেখেছেন:

Chambal's father is giving him a bicycle on his birthday.

এ রকম ভাবে, আগে থেকে ঠিক করা থাকলে ভবিষ্যতে যা হবে তার বেলা ইং লাগানো যায়।

The Roys are going to Puri when the schools close for the summer-holidays.

The schools are closing next week.

The Roys are leaving for Puri on the 18th.

কিন্তু সব জায়গায় ইং লাগে না, আগেই বলেছি। তার কয়েকটা উদাহরণ তোমাদের দিয়েছি। আরও আছে।

যেমন, মনের ভাব যাতে বোঝায় সে-রকম জায়গায় সাধারণত ইং লাগে না:

Chameli loves Araballi.

I feel you are wrong.

I fear I'll be late.

প্রসাদ

শিশুদের– কিশোরদের– যত ছোটদের বই

সত্যজিৎ রায়
বাদশাহী আংটি ৫·০০
এক ডজন গপ্পো ১০·০০
প্রোফেসর শঙ্কুর কাণ্ডকারখানা ৫·০০
গ্যাংটকে গণ্ডগোল ৫·০০
সোনার কেল্লা ৬·০০
বাক্স-রহস্য ৫·০০
কৈলাসে কেলেঙ্কারি ৫·০০
সাবাস প্রোফেসর শঙ্কু ৬·০০
রয়েল বেঙ্গল রহস্য ৫·০০
আরো এক ডজন ১০·০০
জয় বাবা ফেলুনাথ ৬·০০
ফটিকচাঁদ ৮·০০
ফেলুদা এণ্ড কোং ৮·০০
মহাসংকটে শঙ্কু ৬·০০

শিবরাম চক্রবর্তী
হর্ষবর্ধন নিত্যনূতন ৪·০০
শিব্রামের বারো আড্ডি ৫·০০
দিগ্বিজয়ী হর্ষবর্ধন ৬·০০
এক মেয়ে ব্যোমকেশের কাহিনী ৬·০০

গৌরাঙ্গপ্রসাদ বসু ও মন্মথ চৌধুরী
নিশীত রাতের আহ্বান ৩·০০

গৌরকিশোর ঘোষ
দুষ্টুর দুপুর ৩·০০

আনন্দ বাগচী
বনের খাঁচায় ৫·০০

পার্থসারথি চক্রবর্তী
কেমিক্যাল ম্যাজিক ৪·০০
চিকিৎসাবিজ্ঞানের আজব কথা ৪·০০
রসায়নের ভেল্কি ৩·০০
ম্যাজিকের মত মজা ৫·০০
তত সহজ ছিলনা ৫·০০

মৌমাছি (বিমল ঘোষ)
রাজার রাজা ৭·০০

শৈলেন ঘোষ
অরুণ বরুণ কিরণমালা ৩·০০
মিতুল নামে পুতুলটি ৪·০০
ছোট্ট সোনার গল্প শোনা ৬·০০
বাজনা ৫·০০
হপ্পোকে নিয়ে গপ্পো ৫·০০
আমার নাম টায়রা ৫·০০

বুদ্ধদেব গুহ
ঋজুদার সঙ্গে জঙ্গলে ৫·০০
মউলির রাত ৫·০০

সুকুমার রায়
সমগ্র শিশুসাহিত্য ১০·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (১ম) ২৫·০০
সুকুমার সাহিত্যসমগ্র (২য়) ৩০·০০
জীবজন্তু ৮·০০

সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার
ছেলেদের বিবেকানন্দ ২·০০

সরলাবালা সরকার
পিনুকুর ডাইরি ৩·০০

মনোজ বসু
ওস্তাদ নটবর ৬·০০

পাপু (সুব্রত সরকার)
পাপুর ছবি সঙ্গে ছড়া ৫·০০
পাপুর বই ৬·০০

হরিনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়
ভয়ের মুখোশ ৫·০০
পাথরের চোখ ৬·০০
সীমানা ছাড়িয়ে ৬·০০
পাঁচমুণ্ডীর আসর ৬·০০

ইন্দ্রমিত্র
বিদ্যাসাগরের ছেলেখেলা ৫·০০
শরৎ কথামালা ১০·০০

বিমল কর

দু-খানি আশ্চর্য বই লিখেছেন ছোটদের জন্য। একটিতে তুমুল হাসি, অন্যটিতে গা-ছমছম উত্তেজনা। জাপান-ফেরৎ ওআণ্ডার মামার গ্যাসবাতি জ্বালানোর কাণ্ড কারখানা যেমন মজাদার, তেমনই এ-যুগের কাপালিক ভুজঙ্গভূষণের ভূত নামানোর অদ্ভুত সব কীর্তিকলাপও দারুণ রোমাঞ্চকর। ওআণ্ডার মামা কীভাবে ব্যর্থ হলেন, আর কীভাবে কিকিরা নামের এক রহস্যময় ম্যাজিসিয়ান ধরে ফেললেন ভুজঙ্গভূষণের যাবতীয় ষড়যন্ত্র আর চালাকি তা জানতে গেলে এক্ষুনি পড়ে ফেলতে হবে 'ওআণ্ডার মামা' এবং 'কাপালিকরা এখনও আছে'—মজা-ম্যাজিক-ভয় মেশানো এই দুটি উপন্যাস।

বিমল করের বই

ওআণ্ডার মামা ৬.০০

কাপালিকরা এখনও আছে ৭.৫০

শঙ্করীপ্রসাদ বসু
আমাদের নিবেদিতা ৬·০০

প্রেমেন্দ্র মিত্র
আগ্রা যখন টলমল ৫·০০
যাঁর নাম ঘনাদা ৫·০০
ঘনাদার ফুঁ ৬·০০

শরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়
ভূমিকম্পের পটভূমি ৪·০০

সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়
ভয়ংকর সুন্দর ৫·০০
সত্যি রাজপুত্র ৫·০০
তিন নম্বর চোখ ৫·০০
হলদে বাড়ির রহস্য ও
দিনে ডাকাতি ৬·০০
সবুজদ্বীপের রাজা ৫·৫০

মতি নন্দী
ননীদা নট আউট ৪·০০
স্ট্রাইকার ৬·০০
স্টপার ১০·০০
কোনি ৬·০০

সমরজিৎ কর
একটি সংকেতের জন্যে ৬·০০

নারায়ণ চক্রবর্তী
হলদে সবুজ ক্রিস্ট্যাল ১০·০০

পূর্ণেন্দু পত্রী
কী করে কলকাতা হলো ৪·০০
ছড়ায় মোড়া কলকাতা ৪·০০

শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়
ক্লাস সেভেনের মিস্টার শেলক ৪·০০

লীলা মজুমদার
বাতাসবাড়ি ৪·০০

অমরনাথ রায়
দেশবিদেশের বিজ্ঞানী ১০·০০

আশাপূর্ণা দেবী
রাজকুমারের পোশাকে ৪·০০

সমরেশ বসু
মোক্তারদাদুর কেতুবধ ৫·০০

অমিতাভ চৌধুরী
তেপান্তরের মাঠে ৩·০০

ননীগোপাল চক্রবর্তী
চরকা বুড়ী ৪·০০
যাদুঘরে চল যাই ৬·০০

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
ঘণ্টাদার কাবলু কাকা ৫·০০
অব্যর্থ লক্ষ্যভেদ এবং ৬·০০
সমগ্র কিশোরসাহিত্য (প্রথম খণ্ড) ২০·০০

গিরিধারী কুণ্ডু
টংসা চু ৫·০০

সুবোধ ঘোষ
সেই অদ্ভুত অভ্রখনি ৫·০০

বিমল মিত্র
রাজা হওয়া ঝকমারি ৭·০০

শিশিরকুমার মজুমদার
তুফান দরিয়ার পরান মাঝি ৫·০০

অন্নদাশংকর রায়
হৈ রে বাবুই হৈ ৫·০০

মঞ্জিল সেন
ডাকাবুকো ৫·০০

রেবন্ত গোস্বামী
অরুমিতুদের কথা ৪·০০

শিশির কর
গলায় বাঘ ৪·০০

শীর্ষেন্দু মুখোপাধ্যায়
মনোজদের অদ্ভুত বাড়ি ৬·০০

অজেয় রায়
ফেরোমন ৬·০০

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড
৪৫ বেনিয়াটোলা লেন কলকাতা ৯
ফোন ৩৪৪৩৬২

মণিমেলার খবর

কেন্দ্রীয় সমাচার

মণিমেলা মহাকেন্দ্রের নিয়মিত শাখাকেন্দ্রগুলি সাম্প্রতিক বন্যায় ক্ষতিগ্রস্তদের সাহায্যে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নিয়েছে। মণিমেলাগুলি বিভিন্ন ত্রাণ-ভাণ্ডারে অর্থ ও বস্ত্র সাহায্য পাঠিয়েছে। শিশুকল্যাণ কর্মীরা খাবার বিতরণ করেছে নানা ত্রাণকেন্দ্রে। চিকিৎসক কর্মীরা কলেরা ইত্যাদির প্রতিষেধক টীকা দিয়েছেন।

মণিমেলাগুলি ঘরোয়া পরিবেশে বিজয়া সম্মেলন ও ভাইফোঁটা উৎসব পালন করেছে। গান্ধীজী ও লাল বাহাদুর শাস্ত্রীর জন্মদিন পালিত হয়েছে ২ অক্টোবর।

মণিমেলার বহুমুখী কার্যক্রম বিভিন্ন অঞ্চলে নতুন-নতুন শাখাকেন্দ্র গড়ে তুলতে অভিভাবক ও শিশুকল্যাণ কর্মীদের অনুপ্রাণিত করেছে। কোনও অঞ্চলে নতুন মণিমেলা গড়তে হলে মণিমেলা মহাকেন্দ্রের সংগে যোগাযোগ করতে হবে। ঠিকানা : রবীন্দ্র সরোবর স্টেডিয়াম, ব্লক-২, রুম-৫ কলকাতা-৭০০০২৯ ফোন : ৪৬-১৮১০ ।

আঞ্চলিক সংবাদ

নৈহাটি আঞ্চলিক খো-খো প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়েছে সম্প্রতি। ভাই ও বোনেদের বিভাগে বিজয়ী হয়েছে যথাক্রমে ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মণিমেলা ও গরিফা মণিমেলা। এই দুটি বিভাগে রানার্স আপ হয়েছে যথাক্রমে প্রগতি মণিমেলা ও ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র মণিমেলা।

মণি সন্দেশ

শ্যামনগরের আতপুর বৈশাখী মণিমেলায় সেণ্ট জন অ্যামবুলেন্স অ্যাসোসিয়েশনের সহযোগিতায় দু'সপ্তাহব্যাপী শিক্ষণ-শিবির বসেছিল। কলকাতার ইণ্টালি মণিমেলার বাৎসরিক মাতৃপ্রণাম অনুষ্ঠানটি পালিত হয়েছে সম্প্রতি। গার্ডেনরীচের আদর্শ মণিমেলা একটি সাংস্কৃতিক প্রতিযোগিতায় বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেছে। বেহালার সোনালী মণিমেলার বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসব অনুষ্ঠিত হয়েছে সম্প্রতি।

শ্যামচকের বিদ্যাসাগর মণিমেলা ষষ্ঠ বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসব, কল্যাণীর অনিন্দিতা মণিমেলা সপ্তম বার্ষিক প্রতিষ্ঠা-উৎসব পালন করেছে। সম্প্রতি অনুষ্ঠিত কলকাতার কসবা মণিমেলার বার্ষিক সাংস্কৃতিক উৎসবে সভাপতিত্ব করেন অন্নদাশংকর রায়। প্রধান অতিথি ও বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন যথাক্রমে শৈলেন ঘোষ ও নবনীতা দেবসেন।

দুঃসাহসিক অভিযান

মার্কো পোলো

মার্কো পোলোর জন্ম হয়েছিল ভেনিসে। লোকে যখন আশেপাশের দেশে যেতে সাহস পেত না তখন মার্কো পোলো মাত্র সতেরো বছর বয়েসে ইটালি থেকে চীন দেশে গিয়েছিলেন। রাস্তাঘাট ছিল অজানা, বিপদে ভরা, কিন্তু কোনো আশংকাই মার্কো পোলোকে দমাতে পারেনি। মার্কো পোলের বাবার নাম ছিল নিকোলো পোলো। তিনি ও তাঁর ভাই চীন দেশে গিয়েছিলেন মার্কো পোলোর চীনে যাওয়ার আগে। সেখানকার রাজা কুবলাই খান তাঁদের সাদরে অভ্যর্থনা জানিয়েছিলেন। তাঁরা দেশে ফিরে এসে ১২৬৯ সালে মার্কো পোলোকে নিয়ে আবার যাত্রা করলেন। স্থলপথে অনেক পাহাড় পর্বত, মরুভূমি, ভীষণ গরম আর ভীষণ ঠাণ্ডা দেশ পেরিয়ে তাঁরা চীনে এসে পৌঁছলেন। সম্রাট কুবলাই খান মার্কো পোলোকে নিজের দরবারে চাকরি দিলেন এবং অল্পদিনের মধ্যেই মার্কো পোলো রাজার প্রিয়পাত্র হয়ে উঠলেন। রাজা তাঁকে চীনের রাষ্ট্রদূত নিযুক্ত করে বিদেশের নানা জায়গায় পাঠালেন। তিনি সব দেশেরই নানা রকম খবর নিয়ে আসতেন। এতে রাজা খুবই খুশি হতেন। সতেরো বছর রাজদরবারে কাটানোর পর মার্কো পোলো আবার ইটালিতে ফিরে যেতে চাইলেন। এই সময় পারস্যের রাজা কুবলাই খানের কাছে নিজের রানী করার জন্যে একজন মহিলা চেয়ে পাঠালেন। রাজা কোকাচীন নামের একটি মেয়েকে পারস্যে পাঠাবেন বলে ঠিক করলেন। মার্কো পোলোর ওপর দায়িত্ব পড়ল মেয়েটিকে পারস্যে পৌঁছে দেওয়ার। সমুদ্রপথে যাত্রা শুরু হল। মার্কো পোলো জাভা, সুমাত্রা, সিংহল প্রভৃতি দ্বীপে গেলেন। সেখান থেকে গেলেন ভারতের মালাবার উপকূলে, গুজরাটে আর সোমনাথে। তারপর পৌঁছলেন ওরমুজ বন্দরে। ৬০০ অভিযাত্রীর মধ্যে মাত্র ১৮ জন বেঁচে ছিলেন। কোকাচীন তাঁদের মধ্যে একজন।

পথক্লান্ত মার্কো পোলো ১২৯৫ সালে, তাঁর চীনযাত্রার ২৫ বছর পরে, আবার ভেনিসে পৌঁছলেন। তারপর তিনি তাঁর যাত্রার বিবরণ লেখেন। তিনি শুধু চীনের বিবরণই লেখেননি, আশেপাশের সব দেশের বিবরণ, সেখানকার মানুষ, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতির কথাও লিখেছিলেন।

মার্কো পোলোর যাত্রার বিবরণ পড়ে ইউরোপের মানুষ অচেনা এশিয়াকে জেনেছিলেন। পরে আবার এই লেখা পড়ে কলম্বাস ও আরও অনেক অভিযাত্রী অনুপ্রাণিত হয়েছিলেন।

দিদিমণি

বই পড়া মানে

খেলা

কয়েকটি বাংলা বই

কাশ্মীর
সে অনেক কালের কথা
বাপু
সকলের সাথী সবার বন্ধু
সোনার অভিযান
ফুল ও মৌমাছি
অযোধ্যার রাজকুমার
রেড ক্রশ কাহিনী
হকি খেলায় ভারত
রূপা নামে হাতিটি

প্রতি বই দেড় টাকা

মেতে থাকা

যাদের কাছে এন বি টি'র বই পাওয়া যাচ্ছে :

পাব্লিকেশন্স ডিভিশন, ৮ এসপ্ল্যানেড ইস্ট; লেখক সমবায় সমিতি, ই-১২ কলেজ স্ট্রীট মার্কেট; স্টার বুক হাউস, ৬৫-এ মহাত্মা গান্ধী রোড; ঊষা পাব্লিশিং হাউস, ১৩/১ বঙ্কিম চ্যাটার্জি স্ট্রীট; সিনহা বুক এজেন্সী, ৭৯/২ মহাত্মা গান্ধী রোড; সায়েন্টিফিক বুক এজেন্সী, ২২ রাজা উডমান্ট স্ট্রীট ॥

তাছাড়া আমাদের অফিসে—

ন্যাশনাল বুক ট্রাস্ট, এ-৫ গ্রীন পার্ক, নয়াদিল্লি ১১০ ০১৬

এন বি টি'র ছোটদের বই শুধু ভাললাগার নয়—আরো আরো ভাললাগার বই।

যেমন গল্প, তেমনি ছবি। আর তেমনি দাম — মাত্র দেড় টাকা! এখন ৪৭টা বই সব ভাষাতেই পাওয়া যাচ্ছে। ক্লাশের বন্ধু যে ভাষাভাষীই হোক—উপহার খোঁজার সমস্যাও আর রইল না, দেখো আর কেনো। নিজের জন্য তো বটেই।

আর

ভাললাগা

লাহোরে হার করাচিতেও তাই

অশোক দাশগুপ্ত

এক দেশে এক ক্যাপ্টেন আছেন। তিনি জানেন টসে জিতলে কী করতে হয়। কোন্ বোলারকে কখন আনতে হয়, কোন্ ফীল্ডসম্যানকে কোথায় দাঁড় করাতে হয়। কখন ইনিংস ডিক্লেয়ার করতে হয়। এবং, বয়স বাড়ার জন্য ফর্ম চলে গেলেও প্রয়োজনের সময় কীভাবে শক্ত হাতে ব্যাট ধরতে হয়, এবং অসম্ভব ক্যাচ মাটিতে গড়িয়ে তুলে নিতে হয়।

তাঁর সৈন্যরা খুব তেজী। তাঁদের মধ্যে কেউ অস্ত্র ছোঁড়েন বিদ্যুতের গতিতে, কারও তীরে মাখানো থাকে ঘূর্ণির বিষ। আর সকলেই পাহারা দেন বাঘের মতো।

সেই ক্যাপ্টেন মুস্তাক মহম্মদ। এবং তাঁর তেজী সৈন্যদের বিরুদ্ধে একলা প্রাচীর তোলেন ছোট্ট শরীরের বিরাট মানুষ— সুনীল মনোহর গাভাসকার।

অনেকদিন আগের কথা। অস্ট্রেলিয়া সফরকারী পাকিস্তান দলের সম্বর্ধনা সভায় ডন ব্রাডম্যানের পাশে বসেছেন হানিফ মহম্মদ, যিনি কিছুদিন আগেই প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে ডন ব্রাডম্যানের বিশ্ব রেকর্ডটি (৪৫২ নট আউট) ভেঙেছেন ৪৯৯ রানের ইনিংস খেলে। কায়েদ-ই-আজম ট্রফির সেই খেলায় দিনের শেষ বলে এক রান নিয়ে পাঁচশোয় পৌঁছতে গিয়ে হানিফ রান আউট হয়েছিলেন।

সেই ভোজসভায় কপট বিস্ময়ের সঙ্গে 'দি ডন' বললেন, "আমি ভেবেছিলাম, আমার রেকর্ডটি যে ভেঙেছে তার ওজন হবে কম পক্ষে দশ টন এবং মাথায় অন্তত সাড়ে ছ' ফুট।"

স্যার ডোনাল্ড ব্রাডম্যান এই টেস্ট সিরিজ দেখলে কী বলতেন জানি না। কিন্তু সারা দুনিয়ার প্রথম দিকের ব্যাটসম্যানদের যিনি কাঁপান, সেই ইমরান খান সিরিজ শেষ হবার পর বলেছেন, "আমার কোনো সন্দেহ নেই যে সানি এখন পৃথিবীর সেরা ওপেনিং ব্যাটসম্যান। আমি শুধু বয়স্কদের কাছে জিজ্ঞাসা করতে চাই, ওর চেয়ে ভাল ওপেনিং ব্যাটসম্যান আপনারা কেউ দেখেছেন কি?"

মাত্র একটি টেস্টের জন্য টীমে এসেই সেলিম আলতাফ এই সানিকে ফিরিয়ে দিলেন মাত্র পাঁচ রানে। ক্যাচটি ধরেই অর্ধেক টেস্ট জেতা হয়ে গেছে—এই ভঙ্গিতে মাজিদ জড়িয়ে ধরলেন মুস্তাককে, টসে জিতেই যিনি সবুজ উইকেটে ভারতকে পাঠিয়েছিলেন প্রথম ব্যাট করতে।

ছোট্ট চেহারার গাভাসকরের আছে এক লম্বা শিষ্য—বোম্বেরই দিলীপ বেঙ্গসরকার, নতুন ব্যাট কেনার সময়েও যিনি সানির পরামর্শ নিতে ভোলেন না। বেঙ্গসরকারের ছিয়াত্তরের পর সর্বোচ্চ রান বিশ্বনাথ আর মহীন্দরের—২০। এবং দ্বিতীয় টেস্টের এই প্রথম ইনিংসে অতিরিক্ত রান ছিল ২৮!

ইমরান নিলেন চার উইকেট। কিন্তু নিজেকে যিনি "দ্য বেস্ট পেস বোলার অফ ইন্ডো-পাকিস্তান সাবকন্টিনেন্ট" বলেন, সেই সরফরাজই বা পিছিয়ে থাকবেন কেন? সরফরাজের ঝুলিতেও চার উইকেট। অবশ্য, দিনের শেষে মুস্তাকের সবচেয়ে আদরের

ফোটো: নির্মল ভট্টাচার্য

গাভাসকর (দুই ইনিংসেই সেঞ্চুরি, দ্বিতীয়বার)

পিঠ-চাপড়ানি পেয়েছিলেন সেলিম আলতাফ।

জাহির আব্বাস খুব খারাপ লোক। মোটেই আউট না হলে কী ভাবে খেলা চলতে পারে?

জাহিরের যখন ২৩৫, মুস্তাক রান আউট হলেন এবং ইনিংস ঘোষণা করলেন ৬ উইকেটে ৫৩৯ রানে।

জাহির আব্বাস (পাক ব্যাটিংয়ের শক্ত খুঁটি)

ভারত অসাধারণ ব্যাটিং দেখিয়ে পৌঁছে গেল চার উইকেটে ৪০৬ রানে। তারপর শুরু হল সেই বিখ্যাত প্যারেড, যা নানা দেশে, নানা মাঠে আমরা দেখাই। ৪৬৫ রানে ইনিংস শেষ।

মজিদ, মুদাস্সার, জাহির এবং আসিফ অনায়াসে দরকারি রান (২ উইকেটে ১২৮) তুলে নিলেন। পণ্ডিতদের আর একবার বোকা বানিয়ে তথাকথিত নিষ্প্রাণ উইকেটেও ম্যাচ জিতল পাকিস্তান। এই টেস্টে চন্দ্র-বেদী-প্রসন্ন তিনজনে দুই ইনিংসে মিলে করেছেন ১৩ রান। এবং তিনটি উইকেট পাবার জন্য রান দিয়েছেন ৩৫৬!

করাচীতে তৃতীয় টেস্ট ম্যাচের আগে খেলার জয়-পরাজয় ছাড়াও দুটি চিন্তা সুনীল গাভাসকরকে ঘিরে রেখেছিল। এক, সব দেশের মাটিতে টেস্ট সেঞ্চুরি করার রেকর্ডটা কি ছোঁয়া যাবে না? দুই, দু'একজন বিখ্যাত ভারতীয় ক্রিকেট লেখকের অভিযোগ মতো তিনি কি সত্যিই দ্রুত রান তুলতে পারেন না?

প্রথম প্রশ্নের ফয়সালা হল প্রথম ইনিংসেই। গাভাসকরের ১১১ ধৈর্য আর প্রতিজ্ঞার ফসল। আগের টেস্টের ৯৩ এবং ৬০ (দ্বিতীয় ইনিংসে) রানের পর চৌহান এবং সুরিন্দর করলেন তেত্রিশ এবং ত্রিশ। কপিল দেবের উনষাট আর ঘাউড়ির বেয়াল্লিশ বোঝাল, হাতে ব্যাট থাকে মারার জন্য, নিখুঁত আউট সুইঙ্গারের দিকে অন্ধ ব্যাট বাড়িয়ে দেওয়ার জন্য নয়।

ভারতের ৩৪৪ রানের ইনিংসের জবাবে পাকিস্তান ছাড়ল প্রচণ্ড হুঙ্কার: নয় উইকেটে চারশো একাশি। মাত্র বেয়াল্লিশ রানে জাহির ফিরে যাওয়ায় এবং মাত্র একশো সাতাশি রানেই পাঁচ উইকেট পড়ে যাওয়ায় ভারতীয় সমর্থকেরা নড়েচড়ে বসলেন। জাভেদ মিয়াঁদাদ আর মুস্তাকও যে খুব খারাপ লোক। আমাদের দরকার হলে কী হবে, ও'রা আউট হতে রাজী হলেন না। জাভেদ একশো আর মুস্তাক আটাত্তর করে যখন ফিরলেন, ভারতের সামনে তখন ম্যাচ বাঁচানোর চিন্তা। ইকবাল কাসিম আর সিকন্দর বখ্‌ত-ও মেজাজে ব্যাট ঘোরালেন— ফ্রেডি ট্রুম্যানের ভাষায় যাকে বলা যায় 'চাকা চালানো'।

একশো সাঁইত্রিশ রানে পিছিয়ে-থাকা ভারত-আবার চলতে শুরু করল সানিকে সামনে রেখে। এবার দ্বিতীয় প্রশ্নটির ফয়সালা, সানি কি দ্রুত রান তুলতে পারেন না? পরবর্তী তিনশো সতেরো মিনিটের অর্ধেক সময় সানি খরচ করলেন এই প্রশ্নের জবাব দিতে। সানির ১৩৭ সোনার ফ্রেমে বাঁধিয়ে তো রাখবই, কিন্তু সোনার চেয়ে দামী কিছু ব্যবহার করলে ভাল হত হয়ত।

কপিল দেব আর ঘাউড়ি আবার প্রাণপণ লড়লেন। কিন্তু লাহোর আর করাচি এক হয়ে গেল শেষ দিন চায়ের পর।

পঁয়ত্রিশ মিনিট প্লাস কুড়ি ওভারে দুই উইকেটে একশো পঁয়ষট্টি রান তুলে ম্যাচ ছিনিয়ে নিল মিয়াঁদাদ আর আসিফের পাকিস্তান।

সিরিজ শেষ হল। "মেন অফ দ্য সিরিজ" হিসেবে পুরস্কার পেলেন সুনীল গাভাসকর এবং জাহির আব্বাস।

মনসুর আলি খান পতৌদি একবার বলেছিলেন, "সেঞ্চুরি করাই ব্যাটসম্যানের কাজ।" সেদিক দিয়ে সানি অবশ্যই কাজের ছেলে।

জাহিরও কিন্তু কথার চেয়ে কাজে বিশ্বাস করেন বেশি। দু'বছর আগে এক কাউন্টি ম্যাচে সাসেক্সের জন স্নো'র বলে পরপর তিনটি চার মারলেন জাহির আব্বাস। ফাস্ট বোলারের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতে স্নো প্রায় চিৎকার করে বললেন, "জানো, বাউন্সারে তোমার মাথার খুলি উড়িয়ে দিতে পারি?"

জাহির কোনো কথা বলেননি। শুধু পরের বলটিকে (বাউন্সার) স্কোয়ার লেগের মাথার ওপর দিয়ে পাঠিয়েছিলেন মাঠের বাইরে।

অবিস্মরণীয় ফ্র্যাঙ্ক উলী

মুকুল দত্ত

অক্টোবরের সতেরো তারিখে ফ্র্যাংক উলী মারা যাবার পর কাগজে তাঁর সম্পর্কে যা লেখা হয়েছে তা পড়ে তোমরা বুঝতে পেরেছ তিনি কতবড় ক্রিকেটার ছিলেন। মারা গেছেন তো একানব্বই বছর বয়সে। দীর্ঘ চল্লিশ বছর আগে ক্রিকেট থেকে তিনি বিদায় নেন। যখন খেলেছেন তখন তো বটেই, খেলা ছাড়ার পর এই চল্লিশ বছর ধরে পৃথিবীর ক্রিকেটারদের কাছে তিনি ছিলেন জীবন্ত বিগ্রহের মতো। তাঁর নাম মাঝে-মাঝেই হয়তো তোমরা শুনেছ। এবং বোধহয় জানো, ফ্র্যাংক উলী ছিলেন আমাদের পতৌদিদের শিক্ষাগুরু। পতৌদির প্রাক্তন নবাব ইসবার আলি খাঁ বিলেতে ক্রিকেটের তালিম পেয়েছিলেন উলীর কাছ থেকে। পরে পুত্র মনসুর আলিও বাবার গুরু উলীর কাছে ক্রিকেটের কলাকৌশল শেখেন।

পৃথিবীর অসাধারণ ক্রিকেট খেলোয়াড়দের মধ্যে ফ্র্যাংক উলী ছিলেন এক বিশিষ্ট খেলোয়াড়। সবচেয়ে বড় কথা, তাঁর সময়ে তাঁর মতো অসাধারণ অল-রাউণ্ডার আর কেউ ছিলেন না। খেলেছেন উনিশশো ছয় থেকে আটত্রিশ সাল অবধি দীর্ঘ বত্রিশ বছর। ন্যাটা খেলোয়াড় ছিলেন। বাঁ-হাতে ব্যাট করতেন, বাঁ-হাতে স্লো বল করতেন, ফীল্ড করার সময় ব্যবহার করতেন দুই হাত। যেমন ব্যাটে, তেমন বলে, আবার তেমনই ফীল্ডিংয়ে সমান দক্ষ ছিলেন। অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে একটি টেস্টে ইংল্যাণ্ডের উইকেট কীপার লেসলি এমস আহত হলে উলীই উইকেট কীপারের দায়িত্ব গ্রহণ করেছিলেন। প্রকৃত অর্থেই ছিলেন অল-রাউণ্ডার। মেদহীন দীর্ঘ দেহ ছিল যেন বেতের মতো নমনীয়। উইকেট কীপার ছাড়া প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁর ১০১৫টি ক্যাচ ধরার বিশ্ব-রেকর্ড তো আজও কেউ ভাঙতে পারেননি। সবচেয়ে বেশি রান-করিয়েদের মধ্যেও স্যার জ্যাক হবসের পরেই উলীর নাম। জীবনে হবস করেছেন ৬১২৩৭ রান, উলী করেছেন ৫৮৯৬৯ রান।

ইংল্যাণ্ডের ক্রিকেট মরসুমে হাজার-রান-করা ব্যাটসম্যানের কৃতিত্বের পরিচয়, শত-উইকেট-দখল বোলারের বাহাদুরির নিদর্শন, ফ্র্যাংক উলী হাজার রান করেছেন আঠাশবার, তার মধ্যেই শত উইকেট নিয়েছেন আটবার। আর একই মরসুমে দু হাজার রান এবং শত উইকেট দখলের কৃতিত্ব চারবার। এটাও রেকর্ড। ক্রিকেটের জনক ডবলিউ জি গ্রেস ছাড়া আর কেউ উলীর মতো এক মরসুমে আঠাশবার হাজার রান করতে পারেননি।

সবচেয়ে কম সময়ে ট্রিপল সেঞ্চুরি করার বিশ্ব রেকর্ড আছে ইংল্যাণ্ডের ডেনিস কম্পটনের। ৩০০ রান করেছিলেন ১৮১ মিনিটে। কম্পটনের পরই উলীর নাম। উনিশশো এগারোয় উলী টাসমানিয়া দলের বিরুদ্ধে ৩০০ রান করেছিলেন ২০৫ মিনিটে। দেখছ তো সব দিকেই কত দক্ষতা ছিল। ইংল্যাণ্ডের পক্ষে ৬৪টি টেস্ট খেলেছেন। তার মধ্যে একটানা খেলেছেন ৫২টি টেস্ট। এটাও ছিল বিশ্ব রেকর্ড। পরে এই রেকর্ড ভেঙে দেন ওয়েস্ট ইণ্ডিজের সোবার্স ও নিউজিল্যাণ্ডের জন রীড। ৬৪টি টেস্টে পাঁচটি সেঞ্চুরি সমেত উলী মোট রান করেন ৩২৮২, উইকেট পান ৮৩টি।

ভারতের বিরুদ্ধে মাত্র একটি টেস্ট খেলেছিলেন উলী। উনিশশো বত্রিশে লর্ডসে ভারতের সেই প্রথম টেস্টে কিন্তু ভাল রান পাননি। প্রথম ইনিংসে ওয়ান-ডাউন ব্যাটসম্যান হয়ে খেলতে নেমে মাত্র নয় রান করার পর লাল সিংয়ের নিক্ষিপ্ত বলে রান আউট হয়ে গিয়েছিলেন। দ্বিতীয় ইনিংসে একুশ রান করে জাহাঙ্গীর খাঁর বলে ক্যাচ তুলে দিয়েছিলেন কোলার হাতে।

যিনি পরবর্তী জীবনে রান-যন্ত্র হয়ে উঠেছিলেন, প্রায় ষাট হাজার রান করেছেন, দু হাজারের বেশি উইকেট পেয়েছেন, সেঞ্চুরি করেছেন ১৪৫টি, প্রথম শ্রেণীর ক্রিকেটে তাঁর প্রথম খেলাটিতে কী করেছিলেন জানো? খেলতেন কেণ্ট কাউণ্টি দলে। উনিশশো ছয় সালের সাতই জুন ওল্ড ট্রাফোর্ড মাঠে কেণ্টের সঙ্গে খেলা ছিল ল্যাঙ্কাশায়ারের। উলীর সে-ম্যাচে খেলার কথা ছিল না। বাঁ-হাতি স্লো বোলার চার্লি ব্লাইথ হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়ায় উলীকে দলে নেওয়া হয়। ব্লাইথ ছিলেন তখনকার দারুণ বোলার। উলী মনে-মনে পুজো করতেন ব্লাইথকে। তাঁর মতো হতে চাইতেন। তাঁর বদলে খেলতে নেমে পেলেন ১০৩ রানে মাত্র একটি উইকেট, দুটি ক্যাচ ফেলে দিলেন। যাঁর ক্যাচ ফেললেন সেই জে টি টাইলডেসলি ২৯৫ রান করেও নট আউট রইলেন। ব্যাট করতে নেমে উলী গোল্লা করে ফিরে আসতেই কেণ্টের সমর্থকরা উলীর বিরুদ্ধে খাপ্পা হয়ে উঠল। চলবে না, চলবে না বলে আওয়াজ তুলল। সেই উলীই পরে কেণ্ট এবং ইংল্যাণ্ডের প্রাণের প্রিয় হয়ে উঠলেন অসাধারণ ক্রীড়ানৈপুণ্যে।

ক্রিকেটে রাজকীয় মহিমার জন্য উলীর জীবিতকালেই কেণ্ট কাউণ্টি ক্লাবের দেওয়ালে তাঁর নামে এক সম্মান-ফলক স্থাপন করা হয়। দেশ-বিদেশের ক্রিকেটাররা সেই ফলকের সামনে দাঁড়িয়ে সম্ভ্রমে মাথা নত করতেন।

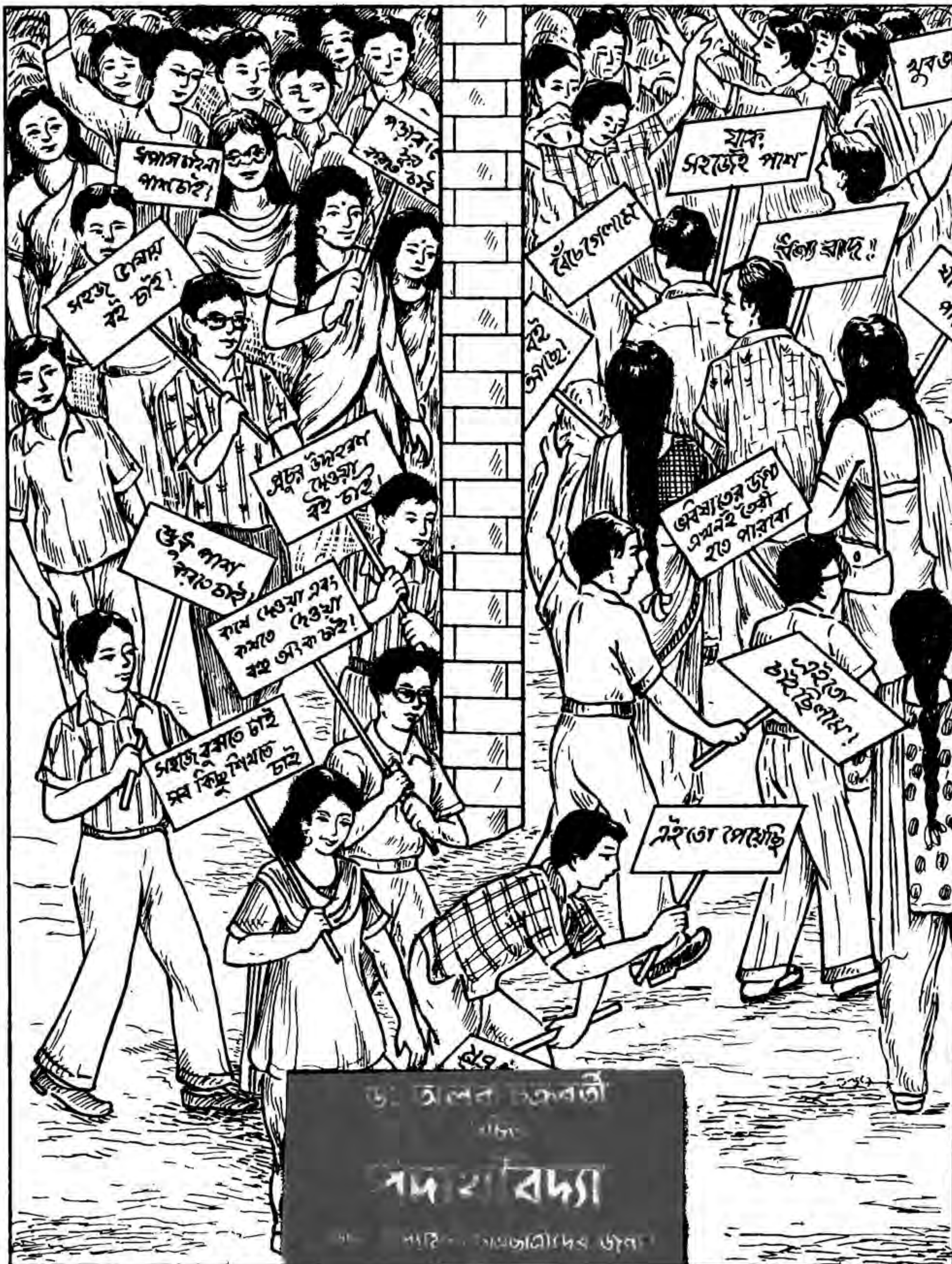

• দি নিউ বুক স্টল • ৫/১ রমানাথ মজুমদার স্ট্রীট, কলিকাতা-৯

'অ্যাশেজ'-এর লড়াই

সুব্রত সরকার

ইয়ান বথাম | গ্রাহাম ইয়ালপ

অস্ট্রেলিয়ারই এক ক্রিকেট অনুরাগী প্রথম 'টেস্ট ম্যাচ' শব্দটির ব্যবহার করেছিলেন। তবে ৮৪ বছর আগে তিনি টেস্ট ম্যাচ খেলার যে তালিকা তৈরি করেছিলেন তাতে সব খেলাই ছিল অস্ট্রেলিয়া-ইংল্যান্ডের। সেই কারণে কি না বলা কঠিন, তবে এখনও অস্ট্রেলিয়ায় অনেকে আছেন যাঁরা ইংল্যান্ড বনাম অস্ট্রেলিয়ার খেলাকেই প্রকৃত টেস্ট ম্যাচ বলে মনে করে থাকেন। তাই কেরি প্যাকারের ওয়ার্ল্ড সিরিজ ক্রিকেটের মতন ভিন্ন আকর্ষণ থাকলেও অস্ট্রেলিয়ায় এবারের গ্রীষ্মে 'অ্যাশেজ'-এর জন্য যে লড়াই হচ্ছে তা নিয়ে অনেকের বিশেষ আগ্রহ আছে।

লণ্ডনের কেনিংটন ওভাল মাঠে ১৮৮২ সালের টেস্ট ম্যাচে অস্ট্রেলিয়া ইংল্যান্ডকে হারায়। এই নিয়ে পরের দিন একটি খেলার কাগজে ঠাট্টা করে এক বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়। ইংলিশ ক্রিকেটের 'মৃত্যু'তে দুঃখ প্রকাশ করে তাতে বলা হয় যে, মৃত দেহের ভস্মাবশেষ, অ্যাশেজ, অস্ট্রেলিয়ায় নিয়ে যাওয়া হবে। ১৮৮২-৮৩ মরশুমে অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ইংলিশ টীম যখন প্রথম দুটি টেস্ট ভাগাভাগি হওয়ার পর সিডনিতে তৃতীয় টেস্টে জয়লাভ করে, কয়েকজন মহিলা খেলার শেষে উইকেটের একটি বেল নিয়ে পুড়িয়ে ফেলেন। তারই ছাই একটি ছোট্ট পাত্রে ভরা হয়। তারপর সেই পাত্রটিকে সীল করে ইংল্যান্ডের অধিনায়ক আইভো ব্লাইকে উপহার দেওয়া হয়। মহিলারা বলতে চেয়েছিলেন যে, তিনি যেন সেই অ্যাশেজ উদ্ধার করলেন!

তাই 'অ্যাশেজ' জিনিসটা পুরো কাল্পনিক নয়। তবে সেগুলি বরাবরই আইভো ব্লাইয়ের (পরবর্তী কালের লর্ড ডর্নলি) ব্যক্তিগত স্মারক-চিহ্ন ছিল। ১৯২৭ সালে লর্ড ডার্নলির মৃত্যুর পরে ওই 'অ্যাশেজ' লর্ডসের মিউজিয়ামে প্রদর্শনের জন্য রাখা হয়। কাগজে যাই লেখা হোক, 'অ্যাশেজ' ইংল্যান্ড জয় করুক বা অস্ট্রেলিয়ার দখলে চলে যাক, সত্যিকারের দ্রব্যটি গত ৫১ বছর ধরে লণ্ডনে কাঁচের শো-কেসের মধ্যে রাখা আছে।

গত ইংলিশ সিজনে ভ্রমণকারী অস্ট্রেলিয়া দল ৩—০ খেলায় ইংল্যান্ডের কাছে টেস্ট সিরিজে হারে, তাই 'অ্যাশেজ' এখন আছে ইংল্যান্ডের কাছেই। তবে ১৯৭৪-৭৫-এ অস্ট্রেলিয়াতে গিয়েই মাইক ডেনেসের ইংল্যান্ড টীম 'অ্যাশেজ' হারিয়েছিল। এবার মাইক ব্রিয়ারলির দল অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে ছয়-টেস্টের সিরিজ খেলছেন। ব্রিসবেনে প্রথম টেস্টের (১—৬ ডিসেম্বর) পর বাকি খেলাগুলি পার্থে (১৫ ডিসেম্বর থেকে), মেলবোর্নে (২৯ ডিসেম্বর থেকে), সিডনিতে (১৯৭৯'এর ৬—১১ জানুয়ারি), অ্যাডিলেডে (২৭ জানুয়ারি থেকে), তারপর আবার সিডনিতে ১০ ফেব্রুয়ারি থেকে হবে।

ইংল্যান্ড অস্ট্রেলিয়া দুটি দলই কেরি প্যাকারের কাছে প্লেয়ার হারিয়েছে। ইংল্যান্ড অবশ্য পাঁচ-ছ'জনকে হারিয়েও তাদের প্রায় সবারই ভাল বদলি খেলোয়াড় পেয়ে গেছে। কিন্তু অস্ট্রেলিয়া এখনও ধাক্কা সামলাতে পারেনি।

তবে, প্যাকার-প্লেয়ার ছাড়াই এক বছর আগে অস্ট্রেলিয়া ভারতকে ৩—২ খেলায় হারায়। ওয়েস্ট ইণ্ডিজে গিয়ে হারলেও তারা যে একেবারে কিছুই দেখাতে পারেনি, তা নয়। তবে কিছুকাল আগে অস্ট্রেলিয়া দলের অধিনায়ক ববি সিম্পসন খেলা থেকে অবসর নিয়েছেন। ওদিকে আবার পয়লা নম্বর ফাস্ট বোলার জেফ টমসন আর টেস্ট ক্রিকেট খেলবেন না ঘোষণা করার পরে প্যাকারের সার্কাসে নাম লিখিয়েছেন।

এবারের ইংল্যান্ড-অস্ট্রেলিয়া 'অ্যাশেজ' সিরিজে অস্ট্রেলিয়া খেলছে নতুন অধিনায়কের নেতৃত্বে। তাদের পেস আক্রমণে নতুন মুখ থাকছে। ওয়েন ক্লার্ক মাত্র পঁচিশ বছর বয়েসে ভারত আর ওয়েস্ট ইণ্ডিজের বিরুদ্ধে ন'টি খেলায় গড়ে ২৭ রানের বিনিময়ে ৪৩টি উইকেট নিয়ে যথেষ্ট কৃতিত্ব দেখিয়েছেন।

অস্ট্রেলিয়ার ব্যাটসম্যানদের মধ্যেও গ্রাহাম ইয়ালপ (৪৯·৩) পিটার টুহি (৪৭) আর ওপেনার গ্রাহাম উড় (৪৩·৪১) অল্প কয়েকটি টেস্ট খেললেও ভালই গড় রেখেছেন। প্রত্যেকে টেস্ট সেঞ্চুরিও করেছেন। তবে এ-কথাও সত্যি যে, এই দলে ইংল্যান্ডের জেফ বয়কটের মতো অভিজ্ঞ খেলোয়াড় একজনও নেই।

বয়কটের বয়স এখন ৩৮। তিনি ৭৪টি টেস্টে ১৬টি শতরান সমেত ৫,৬৭৫ রান করেছেন (গড় ৫১·১২)। প্রথমবার অস্ট্রেলিয়া সফর করেন ১৩ বছর আগে। তখন তিনি ছিলেন মাইক স্মিথের দলের সদস্য। তারপর ১৯৭০—৭১ সালে রে ইলিংওয়ার্থের 'অ্যাশেজ' বিজয়ী দলের সঙ্গে। তবে ডেনেসের অধীনে খেলবেন না বলে ১৯৭৪—৭৫ সালে সফরে যাননি, আর ১৯৭৭'এর মার্চে শতবার্ষিকী টেস্টেও খেলেননি।

অস্ট্রেলিয়া সফরকারী ইংল্যান্ড দলের অধিনায়ক হওয়ার বাসনা বয়কটের বোধহয় আর পূর্ণ হবে না। এবার তিনি সহ-অধিনায়ক পর্যন্ত হতে পারেননি। সেই পদে আছেন ফাস্ট বোলার বব উইলিস। আট বছর আগে উইলিস 'রিলিফ' প্লেয়ার হিসাবে অস্ট্রেলিয়ায় গিয়ে জীবনের প্রথম টেস্ট খেলেন। এখন পর্যন্ত তিনি ৪১টি খেলায় ১৫১টি উইকেট পেয়েছেন, গড় ২৪·১৮। ইংল্যান্ডের আর-এক ফাস্ট বোলার ক্রিস ওল্ড ৪০টি ম্যাচে নিয়েছেন ১২৫টি উইকেট (গড় ২৮·০৮)। তাই অস্ট্রেলিয়ার তুলনায় ইংল্যান্ডের পেস অ্যাটাকও বেশি শক্তিশালী মনে হয়।

তাছাড়া, ইংল্যান্ডের দলে ইয়ান বথামের মতো একজন অসাধারণ তরুণ অল-রাউন্ডার আছেন। বথামের বয়স মাত্র ২৩, তবে ১১টি টেস্টে তিনি তিনটি শতরান সহ পাঁচশো রান করেছেন (গড় ৪১·৬৬)। তাছাড়া ফাস্ট-মিডিয়াম বোলিং করে পেয়েছেন ৬৪টি উইকেট (গড় ১৬·৫৪)। এরই মধ্যে আটবার এক ইনিংসে পাঁচটি বা তার বেশি উইকেট নিয়েছেন, নিয়েছেন ১২টি ক্যাচ। অস্ট্রেলিয়ার কিন্তু এমন একজন তরুণ অল-রাউন্ডার নেই।

সবজে বাতি

দেবীপ্রসাদ
বন্দ্যোপাধ্যায়

জোনাকপোকা জোনাকপোকা আয় দিকি নি,
আয় ঘুরে যা এই দোরে, তোর লম্প কিনি।
সবজে আলো জ্বলবে তো ঠিক? জ্বলবে তো রে?
ফুলবাতাসেই নিববে না তো পটাশ করে?
পিছলে গেলেই ভাঙবে না তো? তুলতে গেলেই
ফোসকা-ছ্যাঁকা লাগবে না তো হাতের তেলোয়?
জ্বালতে গেলে জ্বলবে তো ফের দিন-বেদিনে—
বাদল রাতের চাঁদচিকেশি লোডশেডিঙে
আয় দিয়ে যা, দেখিস, না হয় ফাটাফুটো,
কাজ লাগে তো আবার আসিস, কিনব দুটো।

শুনলি নে? ও জোনাকপোকা, ডাকছি যে রে!
হাই রে বোকা! ঐ বাড়ি যাস এ-দোর ছেড়ে?
ওদের বাড়ি ভর্তি যে সব হ্যাংলা ডাকাত,
হাঁকলে তুলে নেবে তোর ঐ আস্ত ঝাঁকা!
দাম পাবি? ছাড় পাস তো ভালো! শুনবি নে তাও?
আপনা-ভালোর বুঝ বোঝে যে ছারপোকাটাও।
গাঁইয়া দ্যাখো! হ্যাঁ গোঁত্তা' খাও! উলটো ব্যাঁকো!
তেল পুড়িয়ে ধড়ফড়িয়ে কাঁপছে দ্যাখো!
আসলি কেন? ঘর যা না — সেই বনবাদাড়ে—
যা ওড়্‌গা যা হা-কুচকালো জলার পাড়ে...

ছবি বিমল দাশ

প্রকাশের সামনে মস্ত পরীক্ষা

অলোক দাশগুপ্ত

সাত বছর আগের ঘটনা। মাদরাজে জাতীয় ব্যাডমিন্টনের আসর বসেছে। ষোল বছরের ফর্সা, ছিপছিপে লম্বা একটি কানাড়ি ছেলে একই সঙ্গে জুনিয়র এবং সিনিয়র সিঙ্গলস জিতে তাক লাগিয়ে দিল। অনেকেই ভবিষ্যদ্বাণী করলেন, এই ছেলেটি আন্তর্জাতিক আসরে ভারতীয় ব্যাডমিন্টনের মর্যাদা বাড়াবে।

প্রকাশ পাড়ুকোনের সাফল্যের সেই শুরু। টানা সাতবার জাতীয় চ্যাম্পিয়ন হওয়ার রেকর্ডটি এখন তাঁর দখলে। বলা বাহুল্য এই রেকর্ড আরও বাড়বে, কারণ এই মুহূর্তে প্রকাশকে চ্যালেঞ্জ জানানোর মতো খেলোয়াড় ভারতে নেই।

তবে ঘরোয়া আসরে প্রকাশ কী করছেন তা নিয়ে আমরা কৌতূহলী নই। গত সাত বছরে নিজের দুর্বলতাগুলি আস্তে আস্তে কাটিয়ে উঠে প্রকাশ আন্তর্জাতিক তারকার সম্মান পেয়েছেন। ইন্দোনেশিয়ার লিয়েম সুউ কিং, ইলি সুমিরাত, ডেনমার্কের স্বেন প্রি, ফ্লেমিং ডেলফস, চীনের য়ু ইয়ে-তান, তান শিয়েন-হু, চেন তিয়েন লুন এবং ভারতের প্রকাশ পাড়ুকোনের মধ্যে কে যে এখন পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ খেলোয়াড় বলা মুশকিল।

গত বছর শেষের দিকে দু' মাসের ট্রেনিংয়ের জন্য প্রকাশ এবং সৈয়দ মোদি ইন্দোনেশিয়ায় গিয়েছিলেন। এই ট্রেনিং প্রকাশকে অনেক সাহায্য করেছে, কারণ ইন্দোনেশিয়া থেকে ফিরে আসার পর তাঁর খেলায় যথেষ্ট উন্নতি লক্ষ করা গেছে।

সরকারি বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ শুরু হওয়ার আগে পর্যন্ত অল-ইংল্যান্ড টুর্নামেন্টটিকেই বেসরকারিভাবে ব্যাডমিন্টনের বিশ্ব চ্যাম্পিয়নশিপ হিসেবে গণ্য করা হত, ফলে এই প্রতিযোগিতাটির আলাদা একটা মর্যাদা আছে। এবারের প্রতিযোগিতার শুরুতেই অনেকে আশা করেছিলেন প্রকাশ হয়তো চমক দেখাবেন। কিন্তু তাঁর দুর্ভাগ্য, বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফ্লেমিং ডেলফসের বিরুদ্ধে কোয়ার্টার ফাইনাল ম্যাচটা তিনি জিততে পারলেন না। প্রথম দুটি গেম প্রকাশ এবং ডেলফস ভাগাভাগি করে নেওয়ার পর তৃতীয় এবং চূড়ান্ত গেমে প্রকাশ ৮—১ পয়েন্টে এগিয়ে ছিলেন, এমন সময় হঠাৎ তাঁর পায়ের মাংসপেশীতে টান ধরে। ফলে প্রকাশ আর তাঁর স্বাভাবিক খেলা খেলতে পারেননি, ১১—১৫ পয়েন্টে তৃতীয় গেমটি হেরে টুর্নামেন্ট থেকে বিদায় নেন।

এপ্রিলে ভারতীয় ব্যাডমিন্টন দল পিকিং গিয়েছিল আমন্ত্রণমূলক প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে। কোয়ার্টার ফাইনালে প্রকাশ চীনের ১ নম্বর খেলোয়াড় য়ু ইয়ে-তানের মুখোমুখি হন। খেলার শুরুতে হাওয়ার সপক্ষে এলোপাথাড়ি বাইরে মেরে প্রকাশ প্রথম গেমটি হারেন ৪—১৫ পয়েন্টে। দ্বিতীয় গেমে সাইড চেঞ্জ করে প্রকাশ নিজের খেলা ফিরে পান এবং ১৫—৬ পয়েন্টে গেমটি জেতেন। তৃতীয় গেমের শুরু থেকেই প্রকাশ তাঁর আধিপত্য বিস্তার করেন এবং চীনের ১ নম্বর খেলোয়াড়টিকে কোর্টের এক প্রান্ত থেকে আরেক প্রান্তে ছোটাছুটি করিয়ে ১৩—৭ পয়েন্টে এগিয়ে যান। কিন্তু অবিশ্বাস্যভাবে প্রকাশ ঐ ম্যাচটি হারেন তাঁর খেলায় কিছুটা শৈথিল্য এসেছিল বলে। ১৩—৭ পয়েন্টে এগিয়ে গিয়ে তিনি ধরে নিয়েছিলেন ম্যাচ জিতে গেছেন।

এই ম্যাচটির অভিজ্ঞতা প্রকাশকে নিশ্চয় বিরাট শিক্ষা দিয়েছিল। ফলে এবারের কমনওয়েলথ গেমসে আমরা দেখলাম, প্রতিটি ম্যাচ সহজভাবে জিতলেও কোনো প্রতিযোগীকে তিনি হালকাভাবে নেননি। কমনওয়েলথ গেমসে প্রকাশের সোনা জয় কৃতিত্বের ঘটনা হলেও অপ্রত্যাশিত নয়। প্রকাশকে বাদ দিলে পৃথিবীর একেবারে সামনের সারির কোনো খেলোয়াড় কমনওয়েলথ দেশের অন্তর্ভুক্ত নন। এডমন্টনে প্রকাশ সোনা না জিতলে সেটাই সম্ভবত অঘটন হত।

বরঞ্চ অনেক তাৎপর্যপূর্ণ লন্ডনে 'ইভনিং অব চ্যাম্পিয়নস' টুর্নামেন্টে বিশ্ব চ্যাম্পিয়ন ফ্লেমিং ডেলফসের বিরুদ্ধে প্রকাশের জয়। স্ট্রেট সেটে এই ম্যাচটি জিতে প্রকাশ অল-ইংল্যান্ড প্রতিযোগিতায় হারের বদলাই শুধু নেননি, বুঝিয়ে দিয়েছেন তিনি এখন দারুণ ফর্মে আছেন।

প্রকাশের খেলার বৈশিষ্ট্য কী? তিনি সুরেশ গোয়েলের মতো অসাধারণ স্ট্রোক প্লেয়ার নন। কিন্তু আধুনিক ব্যাডমিন্টনে স্ট্রোক প্লের সুযোগ তখনই পাওয়া যায় যখন শরীরটা সেই অনুপাতে পোক্ত হয়। গত বছর নেতাজী ইনডোর স্টেডিয়ামে চীনাদের খেলা যারা দেখেছে তারা নিশ্চয় মেনে নেবে কী প্রচণ্ড গতিতে আজকের ব্যাডমিন্টন খেলা হয়ে থাকে। প্রকাশের সাফল্যের প্রধান কারণ, তিনি শারীরিক পটুতা এবং অনুশীলনের দিকে বিশেষ নজর দিয়েছেন। তাঁর ফিটনেস, স্পীড, স্ট্যামিনা এবং ফুটওয়ার্ক চীনা, ইন্দোনেশীয় এবং ডেন খেলোয়াড়দের সঙ্গে পাল্লা দেওয়ার উপযুক্ত হয়ে ওঠার ফলেই প্রকাশের পক্ষে স্ট্রোক প্লে করার অসুবিধা হচ্ছে না।

সামনেই এশিয়ান গেমস। প্রকাশকে কঠিন পরীক্ষার মুখোমুখি হতে হবে। পৃথিবীর অধিকাংশ সেরা ব্যাডমিন্টন খেলোয়াড় এশিয়াবাসী। ফলে এশিয়ান গেমসে সোনা জেতা মানে পারতপক্ষে বিশ্বশ্রেষ্ঠ সম্মান পাওয়া। প্রকাশ কি পারবেন তাঁর ঈপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছতে?

প্রথম এশিয়ান গেম্‌স

পুষ্পেন সরকার

লালকেল্লায় সূর্যের আলো থেকে জ্বালানো হয়েছে এশিয়ান গেমসের প্রথম মশাল। সামরিক বিভাগ, বিমানবাহিনী এবং বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের মধ্য থেকে বাছাই করা ৫০ জন অ্যাথলিট রিলে রেসে নিয়ে যাবেন সেই মশালটি

ঘড়িতে ঠিক চারটে। ১৬ ঘোড়ার একটি চমৎকার গাড়ি এসে থামল স্টেডিয়ামের দরজায়। গাড়ি থেকে নামলেন ভারতের প্রথম রাষ্ট্রপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ।

রাষ্ট্রপতির আসনে বসার পরে সামরিক ব্যাণ্ডে বেজে উঠল ভারতের জাতীয় সঙ্গীত। সকলে উঠে দাঁড়ালেন। সঙ্গীত শেষ হতেই দেখা গেল আফগানিস্থানের দীর্ঘদেহী ক্রীড়াবিদরা তাঁদের জাতীয় পতাকা নিয়ে ব্যাণ্ডের তালে তালে পা মিলিয়ে স্টেডিয়ামে ঢুকেছেন। পরপর আসছেন বর্মা, সিংহল, ইন্দোনেশিয়া, ইরান, জাপান, ফিলিপিন, সিঙ্গাপুর, তাইল্যাণ্ড এবং ভারতের প্রতিযোগীরা। রাষ্ট্রপতির আসনের সামনে এসে অভিবাদন জানাচ্ছেন সকলে। সামরিক কায়দায় অভিবাদন গ্রহণ করলেন রাষ্ট্রপতি।

মার্চ পাস্ট শেষ করে রাষ্ট্রপতির আসনের সামনে মাঠের মধ্যে দলগুলি পরপর দাঁড়িয়ে গেল। রাজেন্দ্রপ্রসাদ গম্ভীর গলায় বললেন, "আমি প্রথম এশিয়ান গেমসের উদ্বোধন করলাম।" শুনে আনন্দের জোয়ার বয়ে গেল দর্শকদের মধ্যে। কয়েকশো সাদা পায়রা ও হাজার হাজার রঙিন বেলুনে ছেয়ে গেল স্টেডিয়ামের আকাশ। ৩১টি তোপধ্বনি উঠল।

এবার সকলের নজর স্টেডিয়ামের প্রবেশপথের দিকে। ৫৩ বছরের এক স্বাস্থ্যবান পুরুষ দৌড়তে-দৌড়তে ঢুকছেন। কমলালেবু রঙের পাগড়ি মাথায়, পরনে সাদা প্যাণ্ট ও গেঞ্জি। পায়ে সাদা মোজা, সাদা কেডস। হাতে জ্বলন্ত মশাল।

কে এই ভাগ্যবান ? যাঁরা জানেন তাঁরা বললেন, ব্রিগেডিয়ার দলীপ সিং। ১৯২৪ ও ১৯২৮-এর অলিম্পিকে লং জাম্পে ভারতের প্রতিনিধিত্ব করেছেন। লাফিয়েছিলেন ২৩ ফুট ৬ ইঞ্চি। মাঠে এক চক্কর দিয়ে লাফিয়ে-লাফিয়ে সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেলেন একেবারে স্টেডিয়ামের মাথায়। গেমসের সুসজ্জিত আধারে মশাল ছোঁয়াতেই আকাশে লাফিয়ে উঠল শিখা। অনির্বাণ এই শিখাকে সাক্ষী রেখে চলবে প্রতিদ্বন্দ্বিতা।

তারপর প্রতি চার বছর অন্তর একে একে সাতটি এশিয়ান গেমস হয়েছে। নানা দেশে। ডিসেম্বরের তৃতীয় সপ্তাহ থেকে ব্যাংককে শুরু হবে অষ্টম এশিয়ান গেমস।

আবার প্রথম এশিয়ান গেমসের আলোচনায় ফিরে আসছি। প্রথম অনুষ্ঠানে অ্যাথলেটিকস, ফুটবল, বাস্কেটবল, ভারোত্তোলন, সাইক্লিং এবং জলক্রীড়ার প্রতিযোগিতা হয়েছিল। ভারত সব রকম খেলাতেই যোগ দিয়েছিল। ফুটবল দলের অধিনায়ক ছিলেন শৈলেন মান্না।

প্রতিযোগিতা শুরু হওয়ার আগে অনেকের ধারণা ছিল ভারতের প্রতিনিধিরা খুব একটা সুবিধা করতে পারবেন না। জাপানীরা সব সোনা, রুপো ও ব্রোঞ্জ নিয়ে যাবেন। কিন্তু, খেলার মাঠে দেখা গেল যে, ভারতেও অনেক বড় বড় খেলোয়াড় ও অ্যাথলিট আছেন।

১০০ ও ২০০ মিটার দৌড়ে লেভি পিন্টো প্রথম হয়েছিল। ৮০০ মিটার দৌড়ে রঞ্জিত সিং। ১৫০০ মিটার দৌড়ে নিক্কা সিং, ৫০,০০০ মিটার ভ্রমণে ভক্তোয়ার সিং, ১০,০০০ মিটার ভ্রমণে মহাবীর প্রসাদ, ম্যারাথন দৌড়ে ছোটা সিং, ডিসকাস ছোঁড়ায় মাখন সিং, শটপাটে মদনলাল এবং ৪×৪০০ মিটার রিলে দৌড়েও ভারত স্বর্ণপদক পেয়েছিল। ভারতের মেয়ে-অ্যাথলিটরা সোনা না পেলেও দুটি রুপো এবং চারটি ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন। ভারতের মহিলা ও পুরুষ অ্যাথলিটরা মোট ১২টি রুপো এবং ৮টি ব্রোঞ্জ পদক জয় করে অ্যাথলেটিকসে ভারতের সুনাম বাড়িয়েছিলেন।

মেয়েদের অ্যাথলেটিকসে জাপানের সাফল্য ছিল একতরফা। সব ক'টি বিভাগেই প্রথম। স্কুল শিক্ষয়িত্রী টৌকিও যোশিনো ছোঁড়ার তিন রকমের প্রতিযোগিতা বর্শা, ডিসকাস এবং লোহার বল—তিনটিতেই প্রথম স্থান দখল করে আলোড়ন তুলেছিলেন। তিনি ছিলেন ন্যাটা। অর্থাৎ ডান হাতের বদলে বাঁ হাতেই সব ছুঁড়তেন। অ্যাথলেটিকসে ভারত ও জাপানের প্রতিযোগীরাই পদকগুলি লাভ করে নিয়েছিলেন বলা যায়।

দলগত প্রতিযোগিতায় ভারত ছিল অন্য দেশগুলির ওপরে। ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন। শক্তিশালী ইন্দোনেশিয়া এবং আফগানিস্থান দুটি দেশকেই ৩—০ গোলে হারিয়ে এবং ফাইনালে তীব্র প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জাপানের বিরুদ্ধে ১—০ গোলে জয়ী হয়ে ভারতের ফুটবল দল এশিয়ার শ্রেষ্ঠ দল হিসাবে স্বীকৃতি পেয়েছিল। জয়সূচক গোল করেছিলেন বাংলার মেওয়ালাল। ওয়াটার পোলোতেও চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল ভারত।

সাঁতারে ভারতীয় সাঁতারুরা তিনটি সোনা, দুটো রুপো এবং তিনটি ব্রোঞ্জ পেয়েছিলেন। ১০০ মিটার সাঁতারে শচীন নাগ যেভাবে সিঙ্গাপুরের সাঁতারুকে হারিয়েছিলেন, সেটা মনে রাখার মতো।

সমস্ত রকমের খেলাধুলোর বিচারে জাপানের কৃতিত্ব ছিল সব থেকে বেশি। বিশেষ করে সাঁতার, সাইক্লিং এবং অ্যাথলেটিকসে জাপানের ক্রীড়াবিদরা খুবই দক্ষতা দেখিয়েছিলেন। ভারোত্তোলনে ইরান অধিকাংশ পদক পেয়েছিল। বাস্কেটবলে ফিলিপিনের খেলোয়াড়রা ছিলেন সেরা। পদকের হিসাব-নিকাশে জাপানের পরেই ছিল ভারতের নাম। ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতায় জাপান পেয়েছিল ১৬৮ পয়েন্ট, ভারতের সংগ্রহ ছিল ১১৬। দলগত প্রতিযোগিতায় ভারত লাভ করেছিল ৬২ পয়েন্ট এবং জাপান ৪৪ পয়েন্ট।

নোলেদা / অহিভূষণ মালিক

রামানন্দ বন্দ্যোপাধ্যায়

বাঁশ গাছ করার ধরনটা জেনেছ। এবারের নমুনায় দেখো সেই একই ছাঁদের দাগকে সামান্য আঁকাবাঁকা করে খেজুর গাছ পাওয়া গেল। মনে রেখো, যে-গাছই আঁকতে যাও না কেন, তার আকারগত চরিত্রটা সবচেয়ে বড় দিক। খেজুরপাতার ধরনটা আলাদা ভাবে দেখিয়েছি। ভাল করে দেখলে বুঝতে পারবে যে, একই গোড়া থেকে দুটি পাতা বের হয়ে একে অপরের উলটো দিক করে আছে। এটাই খেজুরপাতার বিশেষ চরিত্র।

কারিগর

বাঁশের কাজের জন্যে জোগাড় করা জিনিসের সঙ্গে যোগ করো নাইলন বা কোনো শক্ত সুতো যা মালা গাঁথার কাজে চলতে পারে।

এবার ওপরের নমুনা বা তোমার ইচ্ছেমতো নকশা ঠিক করে কাজ শুরু করো। প্রথমে বাঁশের পাত কেটে নকশা মাফিক আকার করে নাও। মাঝে মাঝে পুঁতি বাঁশের গোল টুকরো ব্যবহার করার জন্যে সব জোগাড় করে গাঁথা শুরু করো। পাতগুলো সুতোয় গাঁথার জন্যে পাতের পেছন দিয়ে সুতো নিয়ে (১নং ছবি) তার ওপর পাতলা বাঁশের পাত কিংবা কাপড়ের টুকরো ফেভিকল দিয়ে জুড়ে দাও। নকশা অনুযায়ী যেখানে-যেখানে পুঁতি আছে সেই সাজমতো গাঁথতে থাকো। গাঁথা শেষ হলে আলাদাভাবে লকেট করে নিয়ে জুড়ে দাও ঠিক মালার মাঝখানে। লকেট করার সময় দেখবে তার উঁচু ভাবটা যেন থাকে। মালা শেষ হলে কোপাল ভারনিস দিয়ে পালিস আনো। ইচ্ছে করলে পাতের মাঝে নানান রঙের পুঁতি বোতাম বা গোল আয়নার টুকরো ব্যবহার করে বাহার আনতে পারো। মালার নানান আকার আর ধরন হতে পারে (২নং ছবি) এবং মালা গাঁথার ধরনও পালটাতে পারে (৪নং ছবি)। এছাড়া একটা জিনিস মনে রাখবে. পাতের বা লকেটের হরেক রকম আকার হতে পারে (৩নং ছবি)। মালা শুরু করার আগে যার জন্যে মালা করছ তার গলার মাপ নেবে।

জেনে রাখো—(১) এই কাজে বাঁশের পাত যেন মোটা হয়। (২) পুঁতির মতো লম্বা-লম্বা (৩নং ছবি) টুকরো পাবে খুব সরু কঞ্চি থেকে। (৩) বাঁশ ভিজিয়ে নিয়ে কাটলে কাটা সোজা হবে। (৪) এতে রঙ ব্যবহার করতে চাইলে "ক্লাইলিন" ব্যবহার করবে।

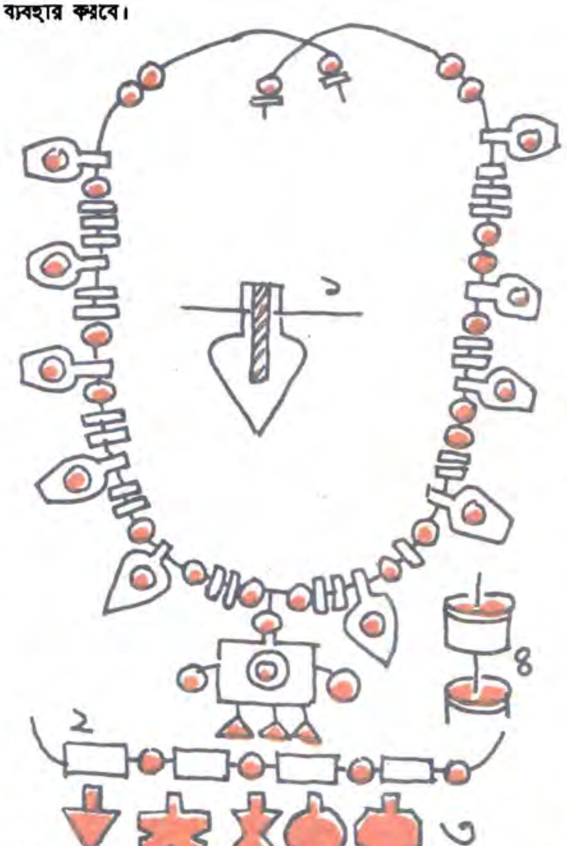

"নতুন ঘড়িটা আমার হাতে
কেমন লাগছে ?

কি মনে হয়, ঘড়িটা আমি কেমন করে পেলাম ?
একি জন্মদিনের উপহার ? না, মোটেও না।
অংকে একশ'র মধ্যে একশ পাওয়ার পুরস্কার ?
না, তাও না। ঘড়িটা আমি কিনেছি। হ্যাঁ,
ইউকোব্যাঙ্কে আমার জমানো টাকা থেকে।
ইউকোব্যাঙ্কে তুমিও অ্যাকাউন্ট
খুলতে পার। ব্যাপারটা খুবই সোজা।"

UCO-CAS/31 BEN

ইউনাইটেড কমার্শিয়াল ব্যাঙ্ক
জনগণকে স্বাবলম্বী করে তুলতে সাহায্য করছে

আনন্দমেলা । ডিসেম্বর ১৯৭৮ । দেড় টাকা কা
ANANDAMELA Regd. No. WB/CC 264 264

কপিল দেব

ফোটো দেবীপ্রসাদ সিংহ